পিপল্‌'স রাইট্‌স

একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা

CPDRS, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র

জুন ২০২৪

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

নির্বাচনের ফল প্রভাবিত করতে কৃত্রিম মেধার অপব্যবহার
— অধ্যাপক স্বাগতম দাস ৩

যেকোনও গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি প্রশ্ন করা
— উজ্জয়িনী হালিম ৫

গণতন্ত্র চিরস্থায়ী নয়, জন্মের মতো তার মৃত্যু আছে
— ডাঃ তরুণ মণ্ডল ১৩

উত্তরের চা-বলয় - চা-শ্রমিকের জীবন সংকট ঃ অতীত ও বর্তমান
— আব্দুল মতিন আমেদ ১৮

মানবাধিকারের দৃষ্টিতে ভারতে শিক্ষার অধিকার আইন
– অধ্যাপক মঙ্গল কুমার নায়ক ২৯

সন্দেশখালির অত্যাচারিত মানুষের পাশে CPDRS —মল্লারিকা কুণ্ডু ৩৩

সাম্প্রতিক বিবৃতি সমূহ ৩৭

সাংগঠনিক সংবাদ ৪৫

সিপিডিআরএস চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত রাজ্য কমিটি ৬১

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক

প্রদীপ দাস

সদস্য

সৌম্য সেন
আব্দুল মতিন আমেদ
জ্ঞানতোষ প্রামাণিক
রাজকুমার বসাক
মঙ্গল নায়ক

যোগাযোগ ঃ

৯৮৮৩৭ ১৭৫৭৫
৮৪২০০ ৯৪৮৮৩
৯০৮৩১ ৪৭৮২১

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

আজ যা গণতান্ত্রিক অধিকার বলে স্বীকৃত, সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নাগরিকরা তা অর্জন করেছে। অথচ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গণতন্ত্রের জয়গান করতে করতেই রাষ্ট্র কর্তৃক সারা বিশ্বজুড়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে নস্যাৎ করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা, সাধারণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অঙ্গীকার করেছিল নাগরিকদের অধিকারগুলিকে রক্ষা করবে। অথচ সর্বত্রই অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারই প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আজ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা মানবাধিকার কর্মীদের লড়াইয়ের অভিমুখ হল অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষা করা, তার পরিসর বৃদ্ধি করা এবং অনার্জিত ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অর্জন করার সংগ্রাম। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই চলমান মহতী সংগ্রামের অংশীদার হয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন ভারতবর্ষে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। ব্রিটিশ যে অধিকার দেয়নি, স্বাধীন ভারতবর্ষে সে অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই ছিল সাধারণ মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই। তার ফলশ্রুতিতেই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে মানুষের বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, দেশের সর্বত্র চলাচলের অধিকার, জাত-পাত ধনী-দরিদ্র লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকার, শোষণ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মেধাগত সমৃদ্ধির অধিকারসহ আরও বহু মানবাধিকার, যা মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের শাসকেরা ব্রিটিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই, একের পর এক গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এর বিরুদ্ধে সারাদেশের অধিকার সচেতন মানুষ তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাত মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৩-২৪ জুলাই দিল্লির গালিব ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে ''সারা ভারত গণতান্ত্রিক সম্মেলন'' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্যে রাজ্যে এই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক কমিটির আহ্বানে ১৯৮৩ সালের ৪ অক্টোবর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিরাট গণতান্ত্রিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী কুলদীপ নায়ার। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নীহারকুমার মুন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরবিন্দ বসু, অগ্নিযুগের বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন, প্রফুল্ল কুমার সেন, সাহিত্যিক শৈলেশ দে, কপিল ভট্টাচার্য, জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সেই সম্মেলন থেকেই গড়ে ওঠে ''সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ''। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাতেই আজকের ''সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস এন্ড সেকুলারিজম'' (সিপিডিআরএস)।

ভারতবর্ষে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল। যে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের উৎসব বলে মহিমান্বিত করে তোলা হল, সেই গণতন্ত্রের যথার্থ চেহারা কেমন? এই গণতন্ত্রে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন কতটা হয়? এ সম্পর্কে সিপিডিআরএস আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ভারতবর্ষের বর্তমান গণতন্ত্রের ক্ষতবিক্ষত চেহারা। সেই বক্তব্যগুলি সহ উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের অবস্থা এবং শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ নিয়ে সিপিডিআরএসের মুখপত্র ''পিপল'স্ রাইটস্''-এর বর্তমান সংখ্যা। এই সংখ্যাটি গণতান্ত্রিক অধিকার তথা মানবাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই প্রত্যাশা করি।

নির্বাচনের ফল প্রভাবিত করতে কৃত্রিম মেধার অপব্যবহার

অধ্যাপক স্বাগতম দাস

মানুষের জন্য সৎ ভাবে কাজ করা বা রাজধর্ম পালনে একনিষ্ঠ থাকার সঙ্গে পরের নির্বাচনে ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসার সমানুপাতিক সম্পর্ক কোনও কালেই ছিল না। এই সম্পর্ককেই আজকের তথ্যকেন্দ্রিকতার যুগে আরও অনেক বেশি জটিল করে ফেলেছে আন্তর্জালে ছড়িয়ে থাকা কৃত্রিম মেধার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা। গত অর্ধ দশকে স্মার্টফোনের ব্যবহারের পরিসংখ্যানে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ভারত। অথচ, এ দেশের তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশই ৩০-৪০ সেকেন্ডের রিলের বাইরের জগতে ঠিক কী ঘটছে, তা বুঝতে অপারগ। আর এইখানেই ভুয়ো তথ্যে নির্মিত আপাতসত্যের ছায়াছবি নির্মাণ করে জনমতকে প্রভাবিত করার খেলা চলছে। শুধু ভারতেই নয়, দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই ধনী রাজনৈতিক দলগুলো চাকরি দিচ্ছে নবীন যন্ত্রমেধার স্নাতকদের, খুলে ফেলছে স্টার্ট-আপ। সমাজমাধ্যমে হাস্যকর রকমের অপেশাদার পোস্ট করতে থাকা তথাকথিত 'আইটি সেল'-গুলো খুব তাড়াতাড়ি খোলনলচে পাল্টে হয়ে উঠছে 'পলিটিক্যাল এআই' (রাজনৈতিক কৃত্রিম মেধা) টিম। আর এখানেই সম্ভবত আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে গণতন্ত্রের এক অনিবার্য বিপর্যয়; প্রকৃত জনমত, রাষ্ট্রের কল্যাণকামী শক্তি এবং নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে বাড়তে থাকা ব্যবধান।

২০০৮-এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শুরু হয়েছিল নেটিজেনদের তথ্য ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারের বিবিধ কৌশল। আজকের নেটদুনিয়ার তুলনায় সে ছিল নিতান্ত প্রস্তরযুগ। এখন যে কোনও বড় নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটদাতাদের মতামতকে প্রভাবিত করা থেকে শুরু করে অঞ্চলভিত্তিক বিরুদ্ধ মতের ভোটারদের চিহ্নিত করে তাঁদের ভয় দেখানোর রকমারি কৌশল, সর্বত্রই বিগ ডেটা প্রযুক্তি ও মেশিন লার্নিং-এর অবাধ অপপ্রয়োগ শুরু হয়েছে।

কৃত্রিম মেধাচালিত এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যখন কোনও মানুষ ইন্টারনেট-ব্যবহারকারীকে নকল করতে পারে, তখন সেই প্রোগ্রামটিকে বলা হয় একটি 'এআই বট'। বট হল রোবটের অপভ্রংশ। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আন্তর্জালেই এদের বাস। বট ও মানুষের সংযোগের যেমন ভাল দিক আছে, তেমনই আছে খারাপ দিকও। আজকের এআই বটগুলোর অন্যতম চালিকাশক্তি হল জেনারেটিভ এআই বা সৃজনশীল কৃত্রিম মেধা; এমন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যার সামনে উদাহরণ হিসাবে আসল ক্যামেরায় তোলা অনেক মানুষের ছবি হাজির করা হলে, এই ছবিগুলোর অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামো বুঝে ফেলে সে নিজেই বানিয়ে ফেলতে পারে এমন নকল ছবি, যাতে ক্যামেরায় ধরা এক জন হাসিমুখের মানুষ আছেন যিনি আদৌ কখনও পৃথিবীতে জন্মাননি।

জেনারেটিভ এআই-এর এই নকল তথ্য বানানোর দুর্দান্ত ক্ষমতাটি এখন বিস্তৃত হয়েছে নকল ভিডিয়ো, টেক্সট, এবং অডিয়ো-র মতো বহুমাত্রিক তথ্যের ক্ষেত্রেও। এক জনের ধড়ে আর এক জনের মাথা বসিয়ে দেওয়া কিংবা ঘরের সোফায় বসে তোলা আপনার ছবির পটভূমিতে পুরীর সমুদ্র এনে ফেলা; ডিজিটাল ছবির জগতে এ সব কারিকুরি প্রচলিত ছিল বহু বছর ধরে। তবে, খুঁটিয়ে দেখলে অনেক সময়েই নকলটি ধরে ফেলা যেত। আজকের দিনে ডিপফেক-এর মতো প্রযুক্তি এসে আসল-নকলের ফারাক বোঝার কাজটিকে কঠিনতর করে তুলেছে। মানব স্নায়ুতন্ত্রের অনুকরণে নির্মিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফলতম অধ্যায় অর্থাৎ 'ডিপ লার্নিং' এবং 'ফেক'; এই শব্দ দুটো মিশিয়ে তৈরি হয়েছে ডিপফেক। নকল, কিন্তু একেবারে আসলের মতো ছবি, ভিডিয়ো, অডিয়ো বানানোতে এর জুড়ি নেই।

স্বভাবতই এর অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রটি রাজনীতির অঙ্গনেও প্রসারিত হয়েছে। ডিপফেকের সাহায্যে তৈরি কোনও ভিডিয়োতে হয়তো দেখা যাচ্ছে এক জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রতিপক্ষকে অসাংবিধানিক ভাষায় আক্রমণ করছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহু কোটি মানুষ দেখে ফেলছেন ভিডিয়ো ক্লিপটি। যত দিনে সত্যতা যাচাই করে জানা যাবে যে ভিডিয়োটি ভুয়ো, তত ক্ষণে সেই নেতার ভাবমূর্তির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমেরিকায় জো বাইডেন থেকে পাকিস্তানে ইমরান খান, অনেকেই

ডিপফেকের শিকার হয়েছেন গত এক-দেড় বছরে। এর উল্টোটাও অবশ্য হচ্ছে; মুখ ফস্কে কুকথা বলে ফেলা নেতা দাবি করছেন, সেই ক্লিপটি আসলে ডিপফেকের কারসাজি! সমস্যার গভীরতা মেনে নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে দাবি উঠছে, যে সব কোম্পানি জেনারেটিভ এআই-এর সফটওয়্যার বাজারে আনবে, তাদের আসল আর নকল কনটেন্টের ফারাক করার প্রোগ্রামকেও রাখতে হবে ব্যবহারকারীদের নাগালের মধ্যে।

সমাজমাধ্যমই এখন আমাদের রাজনৈতিক তরজার চণ্ডীমণ্ডপ। টাইপ করা প্রতিটা শব্দ, পোস্ট করা ছবি বা ভিডিয়ো থেকে যায় সমাজমাধ্যমের বিস্তীর্ণ যান্ত্রিক স্মৃতির মধ্যেই। এই সব ডিজিটাল স্বাক্ষর থেকে আপনার বা আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পছন্দ বুঝে নিয়ে আমাদের মনের মতো করে দলীয় কর্মসূচি ও বিজ্ঞাপন সাজিয়ে আমাদেরই মোবাইল কিংবা সমাজমাধ্যমে পাঠাতে থাকা আজকের বিগ ডেটা প্রযুক্তির পক্ষে খুবই সহজ। মানুষের রাজনৈতিক মতামতকে প্রভাবিত করার পক্ষে এআই বটের ব্যবহারের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হয়ে থাকবে ২০১৭-র মে মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ভোটের ঠিক আগে হঠাৎই ফেসবুক ও টুইটারে বন্যার মতো আছড়ে পড়ে স্বয়ংক্রিয় বটের স্রোত, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ইমানুয়েল মাকরঁ-র হ্যাক করা বিভিন্ন বৈদ্যুতিন বার্তার সঙ্গে বিবিধ নকল রিপোর্ট মিলিয়ে ভোটারদের সামনে নির্মাণ করা হয় এক ধরনের আখ্যান, যেখানে মাকরঁ চিহ্নিত হন এক জন প্রতারক হিসাবে। পরে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট-এর বিশ্লেষণে সামনে আসে চমকপ্রদ পরিসংখ্যান। গবেষণায় দেখা যায় যে, মুষ্টিমেয় টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই অপপ্রচারের ৫০ শতাংশ কনটেন্ট উৎপন্ন হয়েছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলো থেকে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ১,৫০০ নতুন টুইট এবং আবার প্রতি ঘণ্টায় ৯,৫০০ বার করে রিটুইট হয়েছিল। নির্বাচনের দিন ফ্রান্সে প্রতি ঘণ্টায় এই ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রায় তিন কোটি টুইটার ব্যবহারকারী।

যে কোনও প্রযুক্তি যত পরিণত হয় ওঠে, ততই তার অভিঘাত তীব্রতর হয়, কঠিন হয় তার ফাঁকফোকর ধরতে পারা। ভারতের মতো দেশের পক্ষে এর সুদূরপ্রসারী ফল মারাত্মক। এ দেশের মানুষের বড় অংশ ইন্টারনেটের ব্যবহার ও বিপদ সম্পর্কে অন্ধকারে। মুদির দোকানে ফোন পে-র মাধ্যমে ১০ টাকার লেনদেন থেকে আধার কার্ডটিকে সমস্ত ডিজিটাল পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত করা; এ রকম কত ফাঁক গলে তথ্যের বিরাট জালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে আটকে পড়ছেন তাঁরা, এতে কতটা সুরক্ষিত থাকছে সংবিধান প্রদত্ত মানবাধিকার, এ সব খুব একটা আলোচিত নয় এখনও। এক দিকে যখন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে কে কোন আসনের প্রার্থী হবেন ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন নকল খবর পরিবেশন করে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া থেকে ডিপফেকের মাধ্যমে উঠতি প্রতিবাদী নেতার গোপন মুহূর্তের নকল ভিডিয়ো নেটে ফাঁস করে দেওয়া; এ সবও আজ বিরল নয়। রয়েছে তথ্যে জল মিশিয়ে প্রাক্-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষার কৃত্রিম মেধা নির্ধারিত ফলাফলকে একটি বিশেষ দলের অনুকূলে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও।

তথ্য এই নতুন যুগের পেট্রল হলেও, কৃত্রিম মেধা সেই তেল পুড়িয়ে চলা ইঞ্জিন। তথ্যে কারচুপি থাকলে সেই ইঞ্জিন ঠিকমতো কাজ করবে না। তথ্যের সুরক্ষা ও সত্যতা বজায় রাখার পথে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অজস্র ডিজিটাল কনটেন্ট ও সেগুলোর পিছনে থাকা ছোট-বড় মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, অস্তিত্ব বজায় রাখতে যাদের চব্বিশ-ঘণ্টা টিভি চ্যানেলে, ফেসবুকে, টুইটারে, হোয়াটসঅ্যাপে মুখরোচক খবর পরিবেশিত হচ্ছে।

২০২৪-এর পৃথিবীতে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে একটা অবশ্যম্ভাবী গণ-অভ্যুত্থান বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বন্ধু পুঁজিপতিদের ভাতে মারার চেয়ে অনেক সহজ হল আন্তর্জালের প্রচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা-ভাবনার রাশকে হাতে রাখা, যাতে অজানতেই তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শাসকের একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের লোক-দেখানো মোড়কে পরিপুষ্ট করে তোলে। স্কুলস্তর থেকেই ইন্টারনেটের অপব্যবহার, তথ্যের সুরক্ষা এবং ডিজিটাল কনটেন্টের সত্যতা বিষয়ে নবীন প্রজন্মকে সতর্ক করা না হলে, চোখের আড়ালে গণতন্ত্রের এই ধীর কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুকে আটকানো যাবে না।

[স্বাগতম দাস বর্তমানে Indian Statistical Institute, Kolkata-র অধ্যাপক এবং Artificial Inteligence, Machine Learning, Data Science এর বিশিষ্ট গবেষক। CPDRS আয়োজিত সেমিনারে তাঁর বক্তব্যটি পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হয়। আমরা সেই লেখটি-ই এখানে পুনর্মুদ্রিত করলাম।]

যেকোনও গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি প্রশ্ন করা

উজ্জয়িনী হালিম

ব্যক্তিগতভাবে এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্ -এর পক্ষ থেকে আজকের এই সভার উদ্যোক্তা সিপিডিআরএসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আসতে আসতে আমার সহকর্মীকে বলছিলাম, এই রবিবার দুপুরে বাড়িতে বসে বাংলা সিরিয়াল না দেখে আপাত নিরস সিরিয়াস কথাবার্তা শুনতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা এখানে এসেছেন, তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

আজ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সমাজে প্রচলিত, কিছু মানুষ বক্তৃতা করবেন, বুঝবেন, গবেষণা করবেন এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলবেন। তাতেই কি আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বা নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিসর আরো সুন্দর ও বিস্তৃত করা সম্ভব? যতক্ষণ না সমাজের সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ, নাগরিক সমাজ বলতে ব্যক্তিগতভাবে আমি শুধু শহরের মানুষদের বুঝিনা, সারাদেশের সমস্ত নাগরিক যারা গ্রামে ও শহরে সর্বত্র বসবাস করেন, তারা এই আলোচনাতে কোন না কোন ভাবে, না অংশগ্রহণ করছেন, ততক্ষণ আমার মনে হয় আমরা আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

শুরুতেই খুব সংক্ষিপ্তভাবে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস সম্পর্কে একটা দুটো কথা বলি। এ ডি আর একটা সামাজিক সংগঠন, ইংরেজিতে বললে এনজিও। এই সংগঠনটি বিগত কুড়ি বছর ধরে ডেমোক্রেটিক রিফর্মস অর্থাৎ দেশের গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন, সেই সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করছে এবং সেই সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা করে চলেছে। সেই গবেষণা থেকে যে তথ্য বা গবেষণালব্ধ যে উপলব্ধি, সেটার সূত্র ধরে একাধিক বিষয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া এবং বিভিন্ন নীতিগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করে চলেছে। দিল্লি সহ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সংগঠনের শাখা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাখাটি ''ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ'' নামে পরিচিত। আমি ''ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ''-এ বিগত দশ বছর ধরে স্টেট কোঅরডিনেটর হিসেবে কাজকর্ম দেখছি। কলকাতা ও মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় আমাদের সভাপতি।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্ -এর নাম বিভিন্ন সময়ে খবরে আসে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ইলেক্টোরাল বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে খারিজ করে দিয়েছে। ২০১৭ সালে এই বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্ সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল। দীর্ঘ শুনানির পরে এখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সামনে এল। বারোমাসই নানান ভাবে আমাদের কাজ কর্ম চলতে থাকে।

আজকে আপনাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, ভারতবর্ষের নির্বাচনী প্রক্রিয়া জনমতকে কতটা প্রতিফলিত করে? এক্ষেত্রে একটি বুনিয়াদি কথা হল, যখনই আমরা বলি ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, সেখানে এর সূচক কি? না, এখানে নির্বাচন হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, বর্তমানে যেগুলো গণতান্ত্রিক নয়, যেমন উত্তর কোরিয়া, চীন, রাশিয়া, এমন আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, সেখানেও নির্বাচন হয়। আবার যেখানে গণতন্ত্র ততটা শক্তপোক্ত নয় যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সেখানেও হয় নির্বাচন। বাংলাদেশে তো কিছুদিন আগেই যে নির্বাচন হয়ে গেল, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। ফলে শুধুমাত্র নির্বাচন হওয়াতেই গণতন্ত্র থাকা বোঝায় কিনা, এটা একটা বড় প্রশ্ন।

নির্বাচন ঠিক কি লক্ষ্যে হয় সে বিষয়টা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা কতটা সচেতন ভাবে ভাবি? নির্বাচন হয় জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার জন্য, যাঁরা আমাদের জন্য একটা সরকার গঠন করবেন, সেখানে

বিরোধীপক্ষও থাকবেন এবং সামগ্রিকভাবে তাঁরা কিছু ভালো নীতির নির্ধারক হবেন। তাঁরা এমন কিছু নীতি নির্ধারণ করবেন, যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের সুশাসনের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। সুশাসনের অনেক সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, ছোট করে বললে, সুশাসন এমন এক ব্যবস্থা যেখানে আমাদের মৌলিক মানবাধিকার, সংবিধান স্বীকৃত মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ স্বীকৃত মানবাধিকারগুলো আমরা পাই। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, আমাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা কর্মসংস্থান এই বিষয়গুলো সরকার দেখবে। এছাড়া সামগ্রিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের পরিপূরক পরিকাঠামো ইত্যাদি তৈরি করবে। আমরা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এর কাজকর্মের মধ্যে একটি চর্চা করার চেষ্টা করি, যাতে ভোটদাতারা যথেষ্ট সচেতনভাবে ভোট দিতে পারেন, নিজেরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোট দিতে পারেন। তাঁদের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটা আমাদের করতে হবে।

বর্তমান ভারতের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনের পর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট, বা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন মূলত আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গাইড করে। ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ফরেন কন্ট্রিবিউশান রেগুলেশন এক্ট, কোম্পানি এক্ট, এই আইন গুলো নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, সেই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা নেয়। নির্বাচনে সব থেকে বড় ভূমিকা জনসাধারণের অর্থাৎ নির্বাচকমন্ডলীর, তাঁদের কাছে ভোট একটা বড় ক্ষমতা। আবার দেখুন ভোটের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যাচ্ছে চারিদিক, আমরা ভোট দিচ্ছি। কিন্তু কেন ভোট দিচ্ছি, কাকে ভোট দিচ্ছি, কিভাবে ভোট দিচ্ছি এইগুলোর আলোচনায় কোথাও একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। আমরা ভোট দিয়েছি, সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে স্ট্যাটাস দিতে পারছি, এই পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু একজন নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের কাজটা অনেক ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়ে আসা উচিত এবং ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার শেষ হয়ে যায় না, বরং তার গণতান্ত্রিক কর্তব্যর সূচনা হয়।

ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে আমি একজনকে আইনসভায় পাঠালাম। পাঠানোর পরে সে কি ধরনের কাজকর্ম করল, তার কোন হিসেব-নিকেশ আমি রাখলাম কি? পরের পাঁচ বছর যদি সে কোন আপত্তিজনক কাজকর্ম করে, আমি কোথাও তার প্রতিবাদ করলাম কি? তাঁকে কোন প্রশ্ন করলাম কি? যেকোন গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি প্রশ্ন করা। এখন আমাদের গণতন্ত্র এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রশ্ন করাটাই আজকে সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা সকলেই সেটা জানেন।

যদি গণতন্ত্রে প্রশ্নই করা না যায়, তাহলে সে গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ কি অস্বচ্ছ, মানুষ ভোট দিতে পারেন কি পারেন না, এ নিয়ে আলোচনা অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেন তাঁর ভোট হয়ে গেছে, অনেকে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেন না। বিপুল সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে নির্বাচন করানো, এটাও কি একটা গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের সূচক? কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনাবাহিনীকে নিয়ে এসে নির্বাচন করানো হয়। একটা স্বাধীন দেশে বন্দুকের নলের মুখে দাঁড় করিয়ে যদি নির্বাচন করাতে হয়, তাহলে তা গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দেবে এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবে, কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটা আজ কোথাও স্বাভাবিক ছন্দে নেই।

নির্বাচনে তিনটে পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একদিকে রয়েছেন ভোটার। আর একদিকে রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল বা নির্দল প্রার্থী। আরেকদিকে রয়েছেন, যাঁরা এই পুরো ভোট প্রক্রিয়াটাকে পরিচালনা করেন, তাঁরা। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা কিছু সমস্যা দেখতে পাই।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র বহুদলীয় নির্বাচনী গণতন্ত্র। আজ বহুদলীয় নির্বাচনী গণতন্ত্রের মূল স্বরূপটির থেকে ক্রমশ আমরা উল্টো দিকে হাঁটছি। এই উল্টোযাত্রাকে কিভাবে প্রতিহত করা যায়, তা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই সকলে আলোচনা করবো।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যথার্থ জনমতের প্রতিফলনের

ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে বহু জিনিস রয়েছে। আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব, যেমন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে অর্থশক্তি ও পেশি শক্তির প্রভাব। আজকে এমন কোথাও নির্বাচন হয় না যেখানে অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির প্রভাব কাজ করে না। ব্যতিক্রম আছে কিন্তু ব্যতিক্রম প্রমাণ করে যে বাস্তবটা এরকম নয়। আমি নির্বাচনের মূল স্রোত যা চলছে, সেটার কথাই বলছি। বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী আইনত সর্বাধিক ৯৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারেন। কিন্তু নেতাদের প্রচার দেখে আপনি যে সাধারণ ধারণা করতে পারেন, সেখানে খরচের বহর বহু কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। বিরাট বিরাট কনভয়, চার্টার্ড প্লেন, হেলিকপ্টার, লোকসভা এলাকা জুড়ে প্রচার এগুলো এই সামান্য টাকায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জবাবদিহির বিষয়টা স্পষ্ট নয়, আইন স্পষ্ট নয়, এমন আইন নেই যে এই বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নির্বাচনে একজন প্রার্থী সর্বাধিক কত খরচ করতে পারবে আইনে সেটা বলা আছে কিন্তু সেই প্রার্থীর হয়ে তাঁর দল কত টাকা খরচ করতে পারবে, তার কোন উর্ধ্বসীমা কোথাও বলা নেই। আইনের এই ফাঁক কাজে লাগিয়ে অনেক রাজনৈতিক দল ভোটের প্রচারে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, এক অর্থে এ যেন টাকা দিয়ে ভোট কিনে নেওয়া।

ঠিক ভোটের আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা বিলি করা হচ্ছে বিষয়টা এমন নয়, ভোটের আগে যেটা হয়, সেটা তো হয়ই। টাকার বান্ডিল, মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, সেগুলো আপনারা জানেন। বাস্তবে এটা সারা বছর ধরেই চলতে থাকে। নানা ভাবে ভোটারদের কিছু না, কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। না অধিকার নয়, কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়া - যেটা অধিকার প্রতিষ্ঠার থেকে অনেক ভিন্ন।

আরেকটা হচ্ছে পেশিশক্তির প্রভাব। আমার বাবা এ সম্পর্কে একটা কথা বলতেন, ''আমাদের দেশে আমাদের সমাজব্যবস্থায় যদি আমরা ছেলেমেয়ের বিয়ে দিই, তাহলে আমরা পাত্রপক্ষ, পাত্রীপক্ষ সম্পর্কে খোঁজ খবর করি। খোঁজখবর করি পাত্রপক্ষের পরিবার কি রকম, বাবা মা কি করে, ছেলেটা নেশা করে কিনা, অন্য কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। যে মানুষগুলোর হাতে আমরা এত বড় দেশের, গৌরবময় দেশের ৫ বছরের শাসন ক্ষমতা তুলে দেবো, যারা আমাদের জীবনের প্রায় সমস্ত কিছুই ঠিক করবেন নীতি নির্মাণের মাধ্যমে, তাঁদের সম্পর্কে আমরা খোঁজ খবর করি না। সত্যি সত্যিই আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি না তাঁদের হাতে আমাদের দেশ, আমরা ভারতবাসী কতটা নিরাপদ।''

আমরা আবেগতাড়িত হয়ে অনেক সময় নির্বাচনে ভোট দিই। অথচ আমরা দেখেছি, নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হচ্ছেন, বিভিন্ন দল যাঁদেরকে টিকিট দিচ্ছেন, এদের মধ্যে একটা বড় অংশের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা রয়েছে। শুধুমাত্র চার্জশিট হয়েছে এমন ছাড়াও কনভিক্টেড বা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন এমন প্রার্থীও রয়েছেন নির্বাচনের ময়দানে। এ নিয়ে আমরা যখন বারবার প্রশ্ন করেছি, রাজনৈতিক দল গুলির কাছ থেকে শুনতে হয়েছে, রাজনীতিতে এলে এমন পাঁচ দশটা মামলা থাকবেই। কারণ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের শাসকেরা অনেক মিথ্যে মামলা দেয়। কথাটা আংশিক সত্য। প্রথমত, এইসব এমএলএ এমপিদের বিরুদ্ধে মামলা থাকলে ফাস্ট ট্রাক কোর্টে এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিরোধীদলকে মামলা দেওয়া যায়, বিরোধীদলও দু-চারটে মামলা শাসক দলের এমএলএ এমপিদের বিরুদ্ধে দিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখি যারা শাসন ক্ষমতায় রয়েছে, সেই দলের এমএলএ এমপিদের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে মামলা চালু থাকে। সেটা কেন? মামলা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁরা তো আদালতে দ্রুত এই মামলার নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে পারেন, কে বাধা দেবে? কিন্তু সেটা তো হয়না। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা অনেক গভীরে গিয়ে কাজ করেছি। আসলে কোন মামলা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা সেটা আদালতেই স্থির হয় আর একইসাথে সাধারণ মানুষও বোঝে কোন মামলা সত্যি আর কোনটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা। সার্বিকভাবে বলাই যায় দেশের নির্বাচনে পেশী শক্তির প্রভাব বাড়ছে বই কমছে না।

আরেকটি বিষয় হলো পলিটিক্যাল পার্টি ফান্ডিং। সমস্ত জিনিসটাই তো শেষমেষ অর্থনীতি এবং সমস্ত জোরটাই তো শেষমেষ টাকার জোর। এই রাজনৈতিক দলগুলো যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নামছে নির্বাচনে, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই ক্রমশ তাঁরা আরও অস্বচ্ছ করে তুলছে।

তাঁরা টাকা পান কোথা থেকে? তাঁদের টাকা কারা দেন? কেন দেন? এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা রাখার জন্য অনেক আইন আছে। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই আইনগুলো মানে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ই নেই। এক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক দলই তথ্যের অধিকার আইনের বাইরে থাকতে চান। যদিও চিফ ইনফরমেশন কমিশনের একটা নির্দেশ রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দল পাবলিক অথরিটি অর্থাৎ এরা তথ্যের অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, আমরা পাবলিক অথরিটি নয়। আমরা এর বাইরে থাকতে চাই অর্থাৎ কোথাও তাদের নিজেদের প্রকাশ্যে জবাবদিহিতার জায়গাটাতে অনীহা আছে।

নেতাদের দলবদল আজকাল পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাকে একটা হাস্যকর জায়গাতে নিয়ে এসেছে। আমি এই পার্টির হয়ে আজকে নির্বাচনে দাঁড়ালাম, নির্বাচনে জয় লাভ করলাম, কালকে আমি হাসতে হাসতে অন্য পার্টিতে চলে যাচ্ছি। এবং সেই পার্টি আমাকে নিয়েও নিচ্ছে। আবার কিছুদিন সেখানে থাকার পরে সেটাও ছেড়ে দিয়ে, যদি দেখি অন্য পার্টির পাল্লা ভারী, সেখানে চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি -- আসছি, আসছি -- যাচ্ছি। এখানে আমারও লজ্জা করে না এবং যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছে, তাঁদেরও মনে হয় লজ্জা করেনা এবং আমরা প্রশ্ন করি না। এটা নিয়ে যাদের আরো প্রশ্ন করা উচিত, সংবাদ মাধ্যম, তাঁরাও প্রশ্ন করে না। তাঁরা এটাকে একটা মজার খোরাক হিসেবে, আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার এক জ্বলন্ত উদাহরণ, হয়তো এই যাওয়া আসার বিষয়টা তিনি একটু বেশিই করে ফেলেছেন। কিন্তু প্রায় সব দলেই, যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি, অবাধে এই যাতায়াত চলছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে যাকে বলে হর্স ট্রেডিং বা ঘোড়া কেনাবেচা। গোয়া থেকে শুরু করে মনিপুর এবং আরো অনেক জায়গাতে কিভাবে নির্বাচিত সরকার, এমএলএ কেনাবেচার মধ্য দিয়ে বদলে দিয়ে নতুন সরকার আসছে, তা আমরা দেখছি। তাহলে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করে লাভই বা কি? আপনারা খুব সচেতন ভাবে গেলেন, ভোট দিলেন, নির্বাচিত করে আনলেন যে মানুষগুলোকে, তাঁরা গিয়ে টাকা-পয়সার বিনিময় হোক বা অন্য কোন চাপে পড়েই হোক অন্য দলে যোগ দিয়ে দিলেন। জনগণের হাতে ফিরিয়ে আনার অধিকার (Right to Recall) নেই।

জনগণের ম্যান্ডেটকে হেলায় নস্যাৎ করে যে জনপ্রতিনিধিরা, সেটা কি সুস্থ গণতন্ত্রের প্রকাশ?

অনেক সময় আমরা ভোটই দিতে পারি না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যায়। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর তো আরোই বাদ পড়ে যায়। এটা একটা বাস্তব চিত্র। একবার নাম বাদ পড়ে গেলে সেই নাম তোলার প্রক্রিয়াটা আপনারা কজন ভালো করে জানেন? খুব কম মানুষ জানেন। যাঁরা প্রক্রিয়াটা জানেনও, জেনেও কোন লাভ হয় না। জানার পরে সেটা বাস্তবায়ন করাটা একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। ততদিনে হয়তো তিনটে ইলেকশন চলে যাবে, আপনার কাছে ভোটার কার্ড আসবে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে অসচ্ছতা বা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, ভোটার তালিকা থেকেই এটা শুরু।

এছাড়া ইভিএম নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এডিআর থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছে, যেখানে দাবি জানানো হয়েছে, ইভিএমের কাউন্টিংটা ভিভিপ্যাটের সাথে ম্যাচ করে দেখতে হবে। তাহলে একটা সান্তনা থাকে যে, আমি যাকে ভোট দিলাম ভোট সে-ই পেয়েছে। এর মধ্যে একটা মজাও আছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জিতে গেলে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক হয় না, হেরে গেলেই ইভিএম নিয়ে বিতর্ক হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে আরো স্বচ্ছ করা। এ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে একটাই হিয়ারিং হয়েছে, তাতে একটা অবজারভেশন এসেছে, এটা সময় সাপেক্ষ। মানে এই ম্যাচিং করানোটা সময় সাপেক্ষ কিন্তু আমাদের অবস্থানটা হচ্ছে যে সময়টা বড় কথা নয়, একদিন দুদিন বেশি সময় দিতেই পারি, কিন্তু প্রক্রিয়াটা যথাসম্ভব স্বচ্ছ হতে হবে।

নির্বাচন বলতে তো শুধু বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচন বোঝায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনও বোঝায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি হয়, কজন মানুষ গিয়ে কিভাবে ভোট দিতে পেরেছেন, যাঁরা ভোটে দাঁড়াবেন মনে করেছেন তাঁরা নমিনেশন জমা করতে পেরেছেন কিনা, আমরা বিষয়গুলো জানি। সার্বিকভাবেই পরিস্থিতিটা একটু ঘোরালোই।

আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই এই

নির্বাচন হয় ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরে যে যে জিনিসগুলো আঘাত করে, সেই সেই জিনিসগুলো নির্বাচনের উপরেও আঘাত করে। যেমন নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচিত করা। নির্বাচন কমিশনের গঠন কি ভাবে হবে? কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, এরা তিনজন নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করবে। নতুন আইন প্রণয়ন করে ঠিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা হবেন নিয়োগকর্তা। এক্ষেত্রে ২:১ সহজ হিসেব। সেই নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রত্যাশা করব, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে! নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে, শুধু এটা বলাই যথেষ্ট নয়, এটা সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করাতে হবে। সেখানেই গণতন্ত্রের গুণ। আপনাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বোঝাতে হবে, আপনারা সত্যিই নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন।

সংবাদমাধ্যম নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। টিভি সংবাদপত্র ছাড়াও প্রতিদিন হাজারটা হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড আসে। আমরা ছাপার অক্ষরে দেখলেই সেটা বিশ্বাস করি। সত্য মিথ্যা যাচাই করার আগেই মেসেজ ফরওয়ার্ড করতে থাকি। এমন একটা মিথ্যার আবহাওয়া তৈরি হয়েছে চারিদিকে। পেইড নিউজ, ফেক নিউজ খুব বিপদজনক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। খবর এখন তৈরি করা হয়, তৈরি করে মানুষকে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অর্থের জোর বেশি যাদের, তারাই তাদের পক্ষে মিথ্যে খবর তৈরিতে এগিয়ে থাকে।

নির্বাচনী প্রচারে ঘৃণাভাষণ প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে। প্রতিদিনের অসংখ্য ঘৃণাভাষনের মধ্যে খুব অল্পের বিরুদ্ধেই অভিযোগ হয়। সেগুলোই নথিভুক্ত হয়। এর বাইরে অধিকাংশ বড় বড় নেতারা ঘৃনাভাষণ দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে, সেটাও কিন্তু অসাংবিধানিক। নির্বাচন কমিশনের নীতি অনুযায়ী এটা করা যায় না। অথচ যাঁরা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যদি কোন নির্বাচন কমিশনার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেই কার্যত শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাঁর আর প্রমোশন হয় না।

এক দেশ এক নির্বাচন এটাও নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে একটা বড় আঘাত নিয়ে আসতে চলেছে। এক দেশ এক নির্বাচন যদি হয়, আমাদের দেশের যে ফেডারেল স্ট্রাকচার, সেটা থাকবে না। আঞ্চলিক দলগুলো কোন ভাবেই বড় দল গুলোর যে বিপুল টাকার পরিমাণ, তার সাথে প্রতিযোগিতায় পারবে না।

আমরা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এর পক্ষ থেকে সারা ভারতে, প্রতিটি রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের আগে সার্ভে করেছি। ''ভোটার্স বিহেভিয়ার সার্ভে''। যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, তাঁরা কেন ভোট দিতে পারেননি, তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর সার্ভে রিপোর্ট থেকে ভোট না দিতে পারার যে কারণগুলো জানা যায়, ৩১ শতাংশের নাম নথিভুক্ত নেই, ৩৮ শতাংশের নাম হারিয়ে গেছে, ৩ শতাংশ মানুষ বেঁচে নেই, ১৭ শতাংশ ভোট দেওয়ার জন্য শহরে ছিলেন না এবং ১১ শতাংশের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ নেই। বেশিরভাগটাই হচ্ছে নাম নথিভুক্ত নেই অথবা নাম বাদ গেছে। সন্ত্রাসের বিষয়টা বাদ দিলেও, এখান থেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতার শুরু।

আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন, গণতন্ত্র থাকবে কি যাবে, এই বিষয়ে যখন আমরা ভাবছি, তখন ভাবতে হয় মানুষের মূল সমস্যা নিয়ে কি নির্বাচন হয়? নির্বাচনের সময় বা নির্বাচন ছাড়াও সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কি? এই বিষয়ে আমরা যখন সমীক্ষা করেছি, দেখেছি, মানুষ চায় সরকার ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র করবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে, ভালো রাস্তা করবে, কৃষি ক্ষেত্রে নানা রকম সহযোগিতা করবে। মানুষ চায় সরকার ক্ষমতায় এলেই কাজগুলো করবে। সরকারের কাজে মানুষ কতটা খুশি, এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মানুষ যে মূল্যায়ন করছে তা থেকে স্পষ্ট যে সরকারের কার্যকলাপে মানুষ খুশী নয়। ৫ (খুব ভালো) এর মধ্যে সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২.৫ বা ২.৭ (মধ্যম) এর বেশী পায় নি। অথচ সেই সরকারকেই ভোট দিয়ে মানুষ ক্ষমতায় নিয়ে আসছে। মানুষ কি ভেবে, কি চিন্তা করে এই জায়গাটায় আসছে, এ বিষয়ে আমাদের আরো ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে।

আমি এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটাও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দুটো ভাগ করা আছে, একটা হচ্ছে গ্রামীণ নাগরিকরা কি বলছেন, আর দ্বিতীয়ত, শহরের নাগরিকরা কি বলছেন? গ্রামীণ নাগরিকেরা চান কৃষি ঋণ, কৃষিজাত পণ্যের সঠিক মূল্য, বীজসারে ভর্তুকি। এগুলোই গ্রামীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। শহরের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে কর্মসংস্থান, পরিষ্কার পানীয় জল, সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। মানুষ বলছেন এগুলোই করা উচিত সরকারের, একটা দল ক্ষমতায় থাকলে এই কাজগুলোই করা উচিত। তাঁরা মূল্যায়ন করেছেন সরকারের। স্কোর সবেরই তিনের নিচে। ২.১৮ থেকে ২.৯২ পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্কোর গেছে কিন্তু ভোট মানুষ যখন দিচ্ছেন, তখন এই কথাগুলো স্মরণে থাকছে না। মানুষ চান যে দল সরকার বানাবে বা ক্ষমতায় থাকবে, তারা এই কাজগুলো করুক কিন্তু এবার তারা যখন ভোট দিতে যাচ্ছেন, তখন সে ক্ষেত্রে এগুলো বিচার করছেন না।

ভোট দেওয়ার সময় মানুষ কিসের দ্বারা প্রভাবিত হন? আমাদের সমীক্ষা বলছে ৪১ শতাংশ মানুষ টাকার দ্বারা প্রভাবিত হন, ৪৮ শতাংশ মানুষ প্রার্থীর জাত ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন, প্রার্থী নিজে মানুষটি কেমন ৬৮ শতাংশ মানুষ প্রভাবিত হন, প্রার্থীর দল দ্বারা প্রভাবিত হন ৭১ শতাংশ মানুষ। এছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ, লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ ভোটারদের প্রভাবিত করে। কিন্তু আমাদের তো বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমাদের ইলেকশন প্রক্রিয়ায় আমরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করি না। আমরা নির্বাচন করি জনপ্রতিনিধিদের। তাঁরা নির্বাচন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের। কিন্তু আগে থেকেই পুরো প্রচারটাই এমনভাবে হয়, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। সেটা মানুষের ভোটকে প্রভাবিত করে। একটা দল কত ভালো কাজ করেছে, তার নিরিখে খুব কম মানুষই ভোট দিচ্ছেন, সেটা একটা সমস্যার জায়গা।

সাধারণভাবে দেখলে ভোটারদের সচেতনতা ভালো। ৭২ শতাংশ মানুষ বলছেন যে, তাঁরা জানেন নির্বাচনে টাকা-পয়সার অবৈধ লেনদেন হয়। এই টাকা পয়সা দিয়ে ভোট কেনা হয় ৩৭ শতাংশ মানুষ এটাও জানেন। কিন্তু তারপরেও এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের কাছে। এর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারছেন না। অর্থশক্তি পেশিশক্তি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে, ২০১৯ এর লোকসভা এবং ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন এর একটা নিদর্শন।

২০১৯ সালের লোকসভায় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৪৩ শতাংশের বিরুদ্ধে নানারকম ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে, যেটা ২০১৪ সালের থেকে ৯ শতাংশ বেশি। পশ্চিমবঙ্গে এটা ৪৯ শতাংশ। নির্বাচনে অর্থশক্তির প্রভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাদের মোট ৪৭৫ জন সাংসদ কোটিপতি। আমরা কজন কোটিপতি? এই ঘরে তো শ'খানেক মানুষ বসে আছেন, ক'জন কোটিপতি? পশ্চিমবঙ্গের ৫৪ শতাংশ এমএলএ কোটিপতি। সাংসদদের গড় সম্পত্তি ২০.৯৩ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বিধায়কদের ক্ষেত্রে ২.৫৩ কোটি টাকা। অনেক চেষ্টা করে, এই প্রক্রিয়াটা চালু করা গিয়েছে যে, নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের জানাতে হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কি কেস আছে? তাঁদের কি টাকা পয়সা আছে? তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের কি টাকা পয়সা আছে? এগুলো জমা হয় ঠিক। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে এগুলো আছে কিন্তু কোনদিন ডাউনলোড করার চেষ্টা করে দেখবেন, যে কেউ এটা সহজে ডাউনলোড করতে পারেন কিনা? অনেকসময় যেটা ডাউনলোড হয়ে আসবে, সেটা পাঠযোগ্য না। নির্বাচনের সময় কয়েক হাজার প্রার্থী এই হলফনামা জমা দেন, নির্বাচন কমিশন কখনই তার থেকে মূল বিষয়গুলো একত্রিত করে জনসাধারণকে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানায় না। আমাদের মত কয়েকটি সামাজিক সংগঠন, তারা এই কাজটা করে। তারা সেগুলো বিশ্লেষণ করে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে এই তথ্যগুলো পান, সেভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সংবাদমাধ্যম তার খানিকটা ছাপে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোন ফৌজদারি মামলা থাকে, তাহলে সেটা সংবাদমাধ্যমে দিতে হবে। কিন্তু সে নির্দেশ পালন না করলে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে কি না সেটা অজানা। এই

হলফনামায় সত্যি কথা লিখল কি মিথ্যে কথা লিখল, এটা নিয়ে স্ক্রুটিনির কোন অবকাশ দেখা যায় না। যে আয় তিনি হলফনামায় দেখিয়েছেন, তার সাথে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি রয়েছে, এটা নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। একটা ইলেকশনে যে আয় দেখাচ্ছেন, পরের নির্বাচনে ৫০০ গুণ, হাজার গুণ আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে? এগুলো নিয়ে কেউ তাদের প্রশ্ন করেনা। সুতরাং এটা একটা খাতায়-কলমে লিখে রাখার বিষয়েই পর্যবসিত হয়েছে।

সাংসদদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে ২০০৯-২০১৪-২০১৯ সালে পরপর লোকসভা নির্বাচনে ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪ শতাংশ এবং ২০১৯ এ ৪৩ শতাংশ হয়েছে। ২০১৯ সালে জেতা, কোন রাজনৈতিক দলের কতজন সংসদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস রয়েছে? বিজেপির জেতা সাংসদদের মধ্যে ২১৬ জন, কংগ্রেসের ২৯ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ জন ও সিপিএমের দুজনের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস আছে। এটা শুধুমাত্র যাঁরা জিতেছেন তাদের মধ্যেই। এটা সমস্ত দলের মধ্যেই আছে। আমরা যে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কথা বলি, এটা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন নির্দেশ আছে। রাজনৈতিক দলগুলো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদের প্রার্থী করলে, তাদের লিখিতভাবে জানাতে হয়, অন্য প্রার্থী না দিয়ে কেন তারা একে প্রার্থী করেছেন? আমরা সেই ব্যাখ্যাগুলো পড়ে দেখেছি। তাঁরা লিখেছেন, এই প্রার্থীর বিরুদ্ধে দশটা কেস আছে কিন্তু মানুষটা অনেক সামাজিক কাজকর্ম করেন। এই মানুষটার বিরুদ্ধে ১৫ টা কেস আছে, এমনকি তার মধ্যে খুন ধর্ষণের মামলাও আছে কিন্তু মানুষটা ভালো মানুষ, শিক্ষিত মানুষ। এভাবেই তাঁরা অভিযুক্ত প্রার্থীর স্বপক্ষে হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটা কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নয়, তবু নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নেয় না। এখানেই বড় গলদ থেকে যায়।

আমরা সারাক্ষণ গলা ফাটিয়ে বলছি, ফৌজিদারী মামলা যাদের আছে, তাদের প্রার্থী করা চলবে না। কিন্তু মানুষ তাদের ভোট দিচ্ছে। আমাদের সমীক্ষার একটা পরিসংখ্যান বলছে, একজন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা, আপাত অর্থে স্বচ্ছ একজন প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনার থেকে ছয় গুণ বেশি। তাহলে একটি রাজনৈতিক দল যেখানে সবটাই ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি, দলীয় রাজনীতি করে যেকোনভাবে ক্ষমতায় বসতে চায়, যার ছয় গুণ বেশি জয়ের সম্ভাবনা, তাকে নিশ্চিত করেই টিকিট দেবে।

মানুষ জেনেশুনেও কেন তাদেরকে ভোট দিচ্ছেন? ৩৬ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তাঁরা জানেন না, তাঁদের কাছে এই তথ্যই নেই, এদের বিরুদ্ধে কি মামলা আছে না আছে? বাকিরা ভোট দিচ্ছেন, প্রার্থী নির্বাচনে কত টাকা খরচ করছেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। একদল মনে করছেন, মামলাগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। যতই প্রার্থী অভিযুক্ত হন, তিনি আমার জাত বা আমার ধর্মের। অনেকেই মনে করেন মামলা যাই থাকুক, তিনি মোটামুটি ভালো, সামাজিক কাজকর্ম করেন।

রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে টাকা পয়সা পায়, তাতেও অনেক অস্বচ্ছতা আছে, সম্প্রতি ইলেক্টোরাল বন্ডের বিষয়টি সামনে আসার আগেও রাজনৈতিক দলগুলো কর্পোরেটদের থেকে বিপুল পরিমাণ চাঁদা নিত। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে টাকা খরচের কোন উর্ধ্বসীমা নেই। নির্বাচনের টাকার প্রভাবটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যেমন কোটিপতি সংসদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ২০০৯ যেটা ছিল ৫৮ শতাংশ, আজকে ২০১৯ এ ৮৮ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দলগতভাবে ২০১৯ এর লোকসভার হিসেবে, বিজেপির কোটিপতি সাংসদ ৮৮ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস ১০০ শতাংশ, সিপিএম ৬৭ শতাংশ, জাতীয় কংগ্রেস ৮৪ শতাংশ। কমবেশি সকলেই আছে একই নৌকায়। মোটামুটি সব দলেই যাঁরা বেশি টাকা খরচ করতে পারেন, তাঁরাই প্রার্থী হচ্ছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোথা থেকে চাঁদা পায়? একটা বড় অংশ এসেছে নির্বাচনী বন্ড থেকে। আমরা জানি, নির্বাচনী বন্ড কর্পোরেটরাই দেয়। আমি আপনি ইলেক্টোরাল বন্ড কিনে নিয়েছি বলে মনে হয় না। কাজেই আজকে আমাদের নির্বাচন, আমাদের রাজনীতিকে কে পরিচালনা করছে? দেখতে গেলে কর্পোরেটরাই তো পরিচালনা করছে। তাদের টাকাতেই নির্বাচন হয়। তাদের টাকাতেই সরকার গঠন হয়। তারাই বকলমে সরকার চালায়।

নির্বাচনী বন্ড থেকে পার্টি ভিত্তিক কে কত টাকা

পেয়েছে, যদি দেখেন, বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে। তারপরে তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস। সিপিএম নির্বাচনী বন্ড থেকে কোন টাকা নেয়নি। সেটা সিপিএমের ঘোষিত অবস্থান। এই প্রেক্ষিতে সার কথা হলো, রাজনৈতিক দলগুলো যে চাঁদা সংগ্রহ করেছে ২০২১- ২০২২ সালে, সেই চাঁদার ৬৫ শতাংশই অজানা উৎস থেকে এসেছে। এই অজানা উৎসটা কি? একটা হচ্ছে নির্বাচনী বন্ড। এই ৬৫ শতাংশের মধ্যে অজানা সূত্র থেকে যে টাকাটা, এসেছে ৮৩ শতাংশ নির্বাচনী বন্ড থেকে। আরেকটা হচ্ছে কুড়ি হাজার টাকার নিচে যে চাঁদা তোলা হচ্ছে, সেটা সংক্রান্ত তথ্য আপনাকে রাখতে হয় না। বিএসপি একটা বড় দল, তারা সব চাঁদাই কুড়ি হাজার টাকার নিচে তোলে। তারা কোন কাগজপত্র রাখেনি। এই অজানা উৎস থেকে টাকা তোলার মানে, কারা এই রাজনৈতিক দলগুলোকে টাকা দিচ্ছে, তা ভোটাররা জানেনা। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ভোটারদের সেটা জানার অধিকার রয়েছে রাজনৈতিক দলকে কে চাঁদা দিল? আমরা জানি চাঁদা দেওয়ার সাথে অধিকাংশ সময় জড়িয়ে থাকে স্বার্থ।

দলবদলের কিছু পরিসংখ্যান আমি আপনাদের সামনে রাখছি। ২০১৪ থেকে ২০২১ এর মধ্যে আমরা একটা সমীক্ষা করেছিলাম, তাতে দেখা যাচ্ছে ২৫৩ জন একটা দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গেছে। সবচেয়ে বেশি গেছে বিজেপিতে। সবচেয়ে বেশি দল ছেড়েছে কংগ্রেস থেকে, তারপরেই আছে তৃণমূল।

আমি আলোচনা শেষ করবো। শুরুতেই যে কথা বলেছিলাম, গণতন্ত্রের উপর আঘাত আসে নানানভাবে। গণতন্ত্রের যে চারটি স্তম্ভ, লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিসিয়ারি ও মিডিয়া, এই চারটি স্তম্ভ যখন ঠিকমতো কাজ করে না, চারটে স্তম্ভের উপর যখন আঘাত আসে, এবং গণতন্ত্রের যে মূলশক্তি জনগণ, তাঁরা যখন যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন না হন, কিছুটা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন, কিছুটা মগজ ধোলাই এর শিকার হন, তখন গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা বড় দুঃসময়। যেটা আপনার বাক স্বাধীনতা থেকে শুরু করে, সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। কিছুদিন পরে আপনি কি খাবেন, কি পড়বেন তার স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হতে বাধ্য। ধন্যবাদ সকলকে।

[CPDRS আয়োজিত সেমিনারে Association for Democratic Reforms সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার Co-ordinator উজ্জয়িনী হালিমের বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।]

গণতন্ত্র চিরস্থায়ী নয়, জন্মের মতো তার মৃত্যু আছে

ডাঃ তরুণ মণ্ডল

আমার পূর্ববর্তী আলোচকরা আজকের বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। আমিও মনোযোগ দিয়ে শুনেছি।

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে উদ্যোক্তারা আলোচনা সভা আয়োজন করেছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। ভারতবর্ষের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিফলন কি সম্ভব? প্রথমেই এর উত্তর দিয়ে দেওয়া ভালো - একদম সম্ভব নয়। প্রথম বক্তা মাননীয়া উজ্জয়িনী যখন বলছিলেন, তারও কনক্লুসান প্রায় তাই। অধ্যাপক স্বাগতম দেখিয়ে দিলেন কারা ইলেকশন চালায়, কারা আমাদের ব্রেন-কে পরিচালনা করে, কারা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, কারা আমাদের পরিবারের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, কারা জাতিবিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে দিতে পারে।

আজকে যে মঞ্চে আমরা আলোচনা করছি 'সমরেশ বসু মঞ্চ'। আজকে যদি তিনি জীবিত থাকতেন, গণতন্ত্রের বর্তমান দশা দেখতে পেতেন। কী চমৎকার কলম ছিল তার! মানুষের জীবন, চাওয়া পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা ও সেই সমাজের বাধা বিপত্তির উপাদান নিয়েই তিনি সব চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন, অবশ্যই তার বিচার বিবেচনা ও বোধের আধারেই। তারা যা লিখেছিলেন, যে পদ্ধতিতে লিখেছিলেন, যাদের জন্য লিখেছিলেন- তাদের তো এখন ইন্টারনেটে সাহিত্য লিখতে হতো!

কিসের জন্য আমরা নির্বাচন করি বা দেশে ভোট হয়। গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র একটা প্রকান্ড অমৃত ভান্ড। এভাবেই প্রজেক্টেড। গণতন্ত্র মানে তো আমরা নাগরিকরা শান্তি চাই, সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে চাই। নেতা নেত্রীরা কেউ বলছেন সোনার ভারত চাই, কেউ বলছেন সোনার বাংলা চাই। আর প্রতিশ্রুতির সোনার ছটায় আমাদের ছোটবেলার গল্প মনে পড়ছে। সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের গল্প..!

আমরা কেমন সোনার ভারত চাই, সোনার বাংলা চাই - আর কেমন ইতিমধ্যে পেয়েছি তার কতগুলো জীবন্ত উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক চন্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচন, গত মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ট্রাকভর্তি ইভিএম মেশিন নিয়ে গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ, গত ২০২৩ ও ২০১৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন যথেচ্ছ গণতন্ত্রের নিদর্শন দেখিয়েছে। আমাদের একদম পাশে হাতের কাছেই সন্দেশখালিতে এখন গণতন্ত্রের ধ্বজা বিশালভাবে উড়ছে। একজন 'বাদশা' বলছেন মাটন চাই, মাটন না হলে আমি চাও খাব না। ওদিকে উন্নাও-এ এবং উত্তরপ্রদেশে আমাদের কিশোরী কন্যাদের ধর্ষণ করে টাঙিয়ে রাখা হচ্ছে গাছের ডালে। এই গণতন্ত্রে! 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এর দেশে! হরিদ্বারের বুকে দাঁড়িয়ে ওই যে এক গেরুয়াধারী বললেন, 'মুসলিম মহিলাদের কবর থেকে তুলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করতে হবে'- এই মহান গণতন্ত্রেই তো আমরা আছি।

এগুলো নিয়ে বললে ইউএপিএ আছে, আফস্পা আছে, এন এস এ আছে। অধ্যাপক স্বাগতম বলেছিলেন মিনিমাম চার মাস জেলে। এখন আর চার মাসে হবে না।

গণতন্ত্র চিরস্থায়ী নয়, জন্মের মতো তার মৃত্যু আছে

শুরুতে মুখবন্ধে অধ্যাপক সৌম্য সেন বলেছিলেন, গণতন্ত্র কিন্তু পৃথিবীতে একদিন ছিল না। সেই জঙ্গলের রাজত্ব থেকে আমরা মানব সমাজের এগিয়ে চলার ধারা যদি দেখি, গুহামানব- আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর এলো দাস প্রথা, রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র তারপর ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পেলাম প্রজাতন্ত্র তথা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধারণা। মহিলা পুরুষ সব সমান। ইকুয়ালিটি। Reason should take the position of authority. নো গড, নো আল্লাহ, নো ঈশ্বর-মানুষ সবার উপরে। যুক্তি বিচার প্রমাণ সবকিছু ঠিক করবে। প্রজারা মতদান করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। প্রয়োজনে থাকবে ফিরিয়ে নেবার অধিকার। এটাই সেদিনের গণতন্ত্রের রূপ। ভলতেয়ার বলেছিলেন, আমি

তোমার মতের সঙ্গে একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার মত বলার এবং বলার অধিকার রক্ষা করার জন্য- আমি আমার জীবন দিতে পারি। মাইনরিটি হলেও, সিঙ্গল হলেও আপনার বলার অধিকার আছে। এটা আজও আমাদের কনস্টিটিউশনে অলংকারের মতো ভাসছে। কথা বলার অধিকার, অ্যাসোসিয়েশন করবার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, জানবার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে কি আছে? তাহলে গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি একদিন শুরুতে এই আওয়াজ তুলেছিল, কারণ তখন রাজতন্ত্রে মানুষের এই অধিকারগুলো ছিল না। আপনি রাজা, আমরা প্রজা। আপনার দয়ায় আছি। আর রাজা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মাঝে শক্তিশালী পুরোহিততন্ত্র। গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র এর পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এনেছিল ব্যক্তির অধিকার। আজকে সেই গণতন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে সব অধিকার। কেন কেড়ে নিচ্ছে? কারণ আজকে তার চূড়ান্ত মার্কেট ক্রাইসিস - বাজার সংকট। অর্থনৈতিক সঙ্কট। যা যে কোন সমাজ ব্যবস্থার ভিত (বেস) হিসাবে কাজ করে। যা কার্যত যে কোনো সমাজের উপরিকাঠামো তথা আইন কানুন রীতি নীতি নির্ধারণ করে।

আজকের ডেমোক্রেসি মানে - অফ দি পিপল, ফর দি পিপল, বাই দি পিপল নয়। এখন ডেমোক্রেসির মানে ফর দি কর্পোরেটস, অফ দি কর্পোরেটস, বাই দি কর্পোরেটস অথবা Of the capitalists, for the capitalists, by the capitalists. Can anybody deny it? যতই আপনি সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার 'গণতন্ত্রের আলখাল্লা' দেখান, কেউ কি আজকে এটা অস্বীকার করতে পারেন ?

সেই জন্য বহু আগে সমাজ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারা ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বকে যারা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন- পৃথিবীতে এমন একটা সমাজ তৈরি করেছিলেন যেখানে কোনো ভিক্ষুক ছিল না, কোনো পতিতালয় ছিল না, কেউ ক্ষুধার্ত ছিলনা, কোনো বেকার ছিল না; সকলের হাতে কাজ ছিল; যার পরিচালকরা প্রথম দুনিয়াতে বুক ফুলিয়ে বলেছিল-- সমস্ত নিউক্লিয়ার অস্ত্র সমর্পণ কর। দুনিয়াতে তার কোনো প্রয়োজন হবেনা। কেউ সে দেশের সঙ্গে সুর মেলাতে আসেনি। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি তখনকার বিস্ময়কর দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলছি । সেই দেশের রূপকার মহান লেনিন বলেছিলেন, আপনারা যাকে পবিত্র গণতন্ত্র বলেন, মনে করেন এটা একটা সমাজ বহির্ভূত উপরের বস্তু এবং যারা তাদের চালান তারা সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশে থাকে। মানে বহুল প্রচলিত প্ল্যানচেটে যেমন থাকে ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড, থার্ড লেয়ার, ফোর্থ লেয়ার তারপর স্বর্গ বা নরকের কাছাকাছি এরকম লেয়ার আর কি ! ছোঁয়া যাবে না। এটা এমন একটা লেয়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। যার নাম স্টেট বা রাষ্ট্র। আসলে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রকে এভাবেই পবিত্র এক শ্রেণী উর্দ্ধ অবস্থানে দেখানো হয়। আসলে তা নয় । রাষ্ট্র কোন না কোন শ্রেণীর হাতে শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার । আর এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ, প্রধান স্তম্ভগুলি আমরা সবাই জানি। বিচার ব্যবস্থা, আইনসভা আমলাতন্ত্র (এক্সিকিউটিভ) এবং চতুর্থ স্তম্ভ যেটা আমাদের দেশে বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে গোদি মিডিয়া নামে। গোয়েবলস এবং মোদির সংমিশ্রণে। ৭৫ বছরের স্বাধীনতা স্নাত এই সমস্ত নগ্ন কদর্য বিকৃত ও বিক্রীত স্তম্ভগুলি আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা করবে ? করতে পারে? কেউ বিশ্বাস করেন? মুশকিল হচ্ছে আজও অনেকেই করেন। তাই এতো সংবিধান ও দেশ রক্ষার অঙ্গীকার। হুংকার।

দুনিয়ার মেহনতি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা লেনিন বলেছেন, যাকে তোমরা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলছ সেটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট মানুষের দ্বারা ৯৯% মানুষের উপর শাসন, শোষণ এবং জুলুম কায়েম করা। তিনি বলতেন কমিউনিস্টরা কোনরকম মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না। বলতেন, আমরা যে সোশ্যালিজম এর উচ্চতর ডেমোক্রেসিতে যাচ্ছি, সেই ডেমোক্রেসিতে শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের রাজ হবে। আর সকলের এই অর্জিত অধিকারকে যারা মানতে চাইবে না সেই শতকরা একভাগ মানুষের উপর শাসন থাকবে কিন্তু কোনো শোষণ থাকবে না।

দেশের গণতন্ত্রের নগ্ন রূপ

১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচন যজ্ঞ চালিয়ে আজকে আমরা কোন্ ডেমোক্রেসিতে আছি ? একটু তথ্য দিই। এখন আমরা প্রায় ১৪৪ কোটিতে পৌঁছে গেছি। যার মধ্যে

আপনি আমি সকলেই আছি। ইকোনমিস্ট বলে একটা সংগঠন আছে বিশ্বে। তারা ডেমোক্রেসির একটা মাপকাঠি করে। তারা বলছে, ইন্ডিয়া ইজ এ ফ্লড অর্থাৎ ডিফেক্টিভ ডেমোক্রেসি। ২০২০ সালের বিচারে এটা ছিল বিশ্বের ৫৩ নম্বর জায়গায়। দেশ নেতাদের দৈনন্দিন ধুনোতে ডায়নামিক ইকোনোমিতে নাকি আমরা বিশ্বে তিন নম্বরে যাচ্ছি! আমাদের উন্নয়নের অশ্বমেধের ঘোড়া এত জোরে ছুটছে! অথচ আমরা তাদের নিক্তিতে ৫৩ নম্বরে আছি। আর ২০২১ এর হিসাবে ৪৬ তম স্থানে। এটা আমাদের দেওয়া তথ্য নয়। ইকোনমিস্ট ডেমোক্রেসি ইনডেক্স-এ কথা বলেছে।

১৯শে ডিসেম্বর ২০২৩ এর হিউম্যান রাইটস ইন্ডেক্স তথ্য বলছে মানবাধিকার রক্ষায় আমরা ১০৯ নম্বর স্থানে। করাপশনে আমরা কত নম্বরে আছি? ট্রান্স পারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ১৮০টি দেশের মধ্যে সমীক্ষা করে বলছে, ৯৩ নম্বর স্থানে আছে ইন্ডিয়া। পাকিস্তান, বাংলাদেশের কাছাকাছি। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা মানব উন্নয়নে আমরা ১৯১টি দেশের মধ্যে ১৩২ নম্বর। বিকাশের কী বাহার! এই ভোট গণতন্ত্র আমরা কেন করব, কিসের জন্য করবো? ভালো থাকতে চাই, সুখে থাকতে চাই আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে- এই তো। এখন তো বলতে হবে আমার সন্তান যেন থাকে শেখ শাহজাহানের হাতে, আদিত্যনাথ অমিত শাহ'দের রচিত রাম-রাজ্যতে !।

রাজতন্ত্র চিরদিন ছিলনা, দাসপ্রথা চিরদিন ছিলনা। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিও চিরকাল থাকবে না। একেও চলে যেতে হবে।

ইলেকশন সম্পর্কে লেনিন বলছেন, আগামী পাঁচ বছর বা চার বছর (যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চার বছর অন্তর হয়) আপনার উপরে কে শাসন করবে, শোষণ করবে, জুলুম করবে সেই অধিকারটা আপনি ভোটের মাধ্যমে দিয়ে আসেন। এখন ভোট দিতে যেতেও সবাইকে হবে না। এটাই তো আমাদের বহুল প্রচারিত এবং বহুচর্চিত গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোট এর সময় নির্বাচন কমিশনই প্রচার করে ভোট আপনার পবিত্র অধিকার। ভোট আপনার বিরাট শক্তি। মানে বেদের মতো, বাইবেলের মতো কোরাণের মত পবিত্র ও শক্তিশালী। আপনিও যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও তা, স্মৃতি ইরানি, রাহুলও তা। অমিতাভ-শাহরুখ-হেমা-কাজল- শচীন -কোহলি সকলেরই একটা করে ভোট। আমারও একটা ভোট, আম্বানিরও একটা। সকলেই একটা ভোট দিচ্ছি। আর এই গণতন্ত্রেই আপনি বেঁচে থাকার জন্য ধুঁকছেন আর আম্বানিরা-আদানিরা প্রতিঘন্টায় ১৯০ কোটি, ১৬৩ কোটি করে আয় করছেন। করোনার সময়ও ওরা করেছে। আর আমরা রাস্তায় রেললাইনে হাসপাতালে বিপর্যস্ত হয়েছি; লক্ষ লক্ষ সহ নাগরিকদের হারিয়েছি। আমাদের দেশের ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ মানে ৩৫ কোটি অনাহারে থাকে। এটা আমার মনগড়া তথ্য নয়। অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ২০২৩ এর রিপোর্ট। ২০১৮ সালে ছিল ১৯০ মিলিয়ন। তিন বছরের কোভিডের এপিসোড নিয়ে চলে গেছে ৩৫ কোটিতে। ১ পার্সেন্ট টপ আমাদের দেশের যারা ধনী তারা ৪০.৬ শতাংশ দেশের সম্পদের মালিক। তারা আমাদের দেশের লোয়ার ৫০% মানুষের যে টোটাল সম্পদ তার তেরো গুণ সম্পদের মালিক। পাঁচ পারসেন্ট টপ ব্রাকেটে যারা আছে তারা দেশের ৬২% প্রপার্টির মালিক। আমাদের ভারতবর্ষে ১০% লোক ৮০% সম্পদের মালিক। টপ ৩০% মানুষ, ৯০% সম্পদের মালিক। তাহলে আমরা কোথায়? সবাই স্মার্ট আমরা। কিন্তু পকেটে কোনো স্মার্টনেস নেই! সব স্মার্টনেস ফোনে। অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া বলছে, এই দেশটা হচ্ছে 'সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট'দের। মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৮৫৯ সালের ডারউইনের থিওরি যা দেশের সরকার স্কুলশিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল এর রিপোর্ট, 'ইন ইন্ডিয়া রিচ আর গেটিং রিচার'। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' হবার কথা যে? ধনবৈষম্যে আমরা দুনিয়াকে টেক্কা দিতে পারি। বিশ্বগুরু এবং এই ভোট গণতন্ত্রেই!

কী মনে হচ্ছে আপনাদের। ভোট দেবেন? আবার বয়কট করলেও তো ধরে নিয়ে যাবে। ইউ এ পি এ লাগিয়ে দেবে, দেশদ্রোহী বলে দেবে, মাওবাদী বলে দেবে, পাকিস্তানের এজেন্ট বলে দেবে, শহুরে নকশাল বলে দেবে। আরো কত কি যে বলবে আপনি জানেন না। জঙ্গি সংগঠন আইএসআই'য়ের লোক বলে দেবে। কোথায় নিয়ে যাবে তার ছয় মাস পর্যন্ত হদিশ পাওয়া যাবে না। কোর্টে যাবেন? বলবে, ওটা আইনেই আছে। সংবিধান সম্মত। দেশের মানুষ

অর্থাৎ আপনাদের ভোটে জেতা প্রতিনিধিরা আইন পাস করেছে। যে বছর আমি পার্লামেন্টে গেলাম ২০০৯ সালে ৯ ডিসেম্বর একটা আইন আনতে চাইল ইউপিএ ২ সরকার। তার মোদ্দা কথা— জামানত তথা সিকিউরিটি ডিপোজিট বাড়ানো। আর আপনি দেওয়াল লিখতে পারবেন না, পোস্টার লিখে দেওয়ালে লাগাতে পারবেন না। সব আপনাকে মিডিয়ার সাহায্যে বা কাগজে বিজ্ঞাপন কিনে প্রচার করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী বিল ২০০৯। আমি এর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছিলাম। শাসকদের চোখে ছোট পার্টি বা জনসাধারণের অর্থের উপর যারা নির্ভর করে চলে তাদের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার ও প্রচারের অধিকারও বাস্তবে সঙ্কুচিত করে দিতে চায়। ঐ বিলে আরও বলেছে সকলকে ভোট দিতে হবে। এটাকে গণতন্ত্র বলে? আপনি দেশের নাগরিক হলেই আপনাকে ভোট দিতে হবে - সে শাহজাহান হোক, আদিত্যনাথ হোক, মোদী হোক, জুমলাকারী হোক- লুটেরা হোক, বলুন এটা উচিত কি? আপনার ভোট আপনি দেবেন কি দেবেন না সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু ভোট দিতে বাধ্য করা উচিত কি? এ তো ফ্যাসিবাদের কণ্ঠস্বর। পার্লামেন্টে বিরোধিতা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, গণতন্ত্রের এগিয়ে থাকা দেশ জার্মানি, ইংল্যান্ডেও ভোটের পার্সেন্টেজ কমতে কমতে ৫০-৬০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে আপনি আমাদের দেশে জোর করে ভোট দিতে হবে কাউকে বলবেন কেন? বন্দুক দেখিয়ে --চলো ভোট দিতে যেতে হবে। আর বাইরে দেখাচ্ছেন গণতন্ত্রের মহোৎসব হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সেই বিখ্যাত কথা— আপনার অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। কোন্ গণতন্ত্র এটা? কি নির্বাচন হচ্ছে? ভোট আপনি নিজের বিবেক অনুযায়ী দিতে পারেন? নাকি বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে আপনি কাউকে ভোট দিতে বাধ্য হন। দেশের ভোট কে পাবে কে পাবেনা তো আসলে ঠিক করে মানি-মাশল পাওয়ার- প্রশাসন ও মিডিয়া পাওয়ার। এর বাইরে অন্য কিছু কি? পৃথিবীর সব তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশেই প্রায় তাই। বুক ফুলিয়ে মাথা দুলিয়ে আমরা এই গণতন্ত্রের বড়াই করি! আর একটা কথা। আজ পর্যন্ত পার্লামেন্টে যা কেউ বলেনি-' আমি বলেছিলাম যে, প্রত্যেক দল ঘোষণা করুক তারা কর্পোরেট- পুঁজিপতিদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নেবেনা। কেউ টুঁ শব্দটি করেননি। কারণ সব দলই তো নেয়। কে কম আর কে বেশি এই নিয়ে ওদের দলাদলি। ওকে এত দিচ্ছ কেন? দেবে না! সিবিআই পাঠিয়ে দিয়েছে, ই ডি পাঠিয়ে দিয়েছে। ৩৪ খানা কোম্পানি, তার আগে কখনো দেয়নি বিজেপিকে, ঢেলে দিয়েছে ৩৪৫ কোটি টাকা। সবার পেছনে ই ডি আর ইনকাম ট্যাক্স-এর নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা! অন্যরা ভাবছে যদি তাদের হাতেও এই ক্ষমতা থাকতো! আবার এই সরকারের আগের পক্ষের সরকারও এসব এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করেছে। আসবে যারা তারা আরও বিপুলভাবে করবে। দুর্নীতির বাইরে কোনো শাসকদল বর্তমান পুঁজিতন্ত্রে থাকতে পারেনা।।

আমি যেটা বলতে চাই আপনাদের, এই দুর্দশা চিরকালীন নয়। রাজতন্ত্র চিরদিন ছিল না, দাসপ্রথা চিরদিন ছিল না। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি চিরদিন টিকে থাকবে না। একেও যেতে হবে । এ মুমূর্ষু, যে কোনদিন মরবে। So called parliamentary democracy must die. Socialist form of higher democracy তে যাবে; আর এ পথেই পরবর্তী উচ্চ ধাপে যাবে সাম্যবাদে। যে দেশের কথা আপনাদের বলেছিলাম, সে দেশ সেদিকেই এগোচ্ছিল। ভেতরের সংশোধনবাদীদের চক্রান্তে ও সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে তারা আবার শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজে ফিরে গেছে। সঠিক রাস্তায় চললে এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফিরে সে দেশের কি দুরবস্থা হয়েছে সবাই তা দেখছেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ছোটবেলায় ভাবতাম ব্রিটিশকে তাড়ালেই বোধহয় কাজ শেষ হয়ে যাবে। পরে অনেক বিচার বিবেচনা করে দেখলাম এরপরেও আর একটা বিপ্লব করার আছে। সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে রাশিয়াকে দেখে এসে বলেছিলেন এ দেশে না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অসম্পূর্ণ থাকতো। অল্প সময়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত কর্মযজ্ঞে তারা শামিল হয়েছে। পৃথিবীর বুক থেকে লোভ নামক বস্তুকে তারা সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলতে চাইছে। যে আদর্শ যে উৎসাহ নিয়ে তারা সম্মিলিত শক্তিতে কাজ করছে তাতে ভরসা হয় তারা পারবে। মহান সমাজতন্ত্রী যোশেফ স্ট্যালিন

এর কথা আপনারা জানেন যিনি ২য় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির হাত থেকে সারা দুনিয়াকে রক্ষা করেছিলেন, শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকে নয়। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কার্যত একা দাঁড়িয়ে। বার্নাড 'শ-এর নাম আপনারা জানেন। ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, নাট্যকার, লেখক, সাহিত্যিক। উনি রাশিয়াতে গিয়েছিলেন একটা টিম নিয়ে ভিজিট করতে। তাদের দেশের অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রে রাশিয়া সম্পর্কে আজগুবি ও মিথ্যা অনেক কিছুই বলে যাচ্ছিল। উনি বলছেন, এর বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না করি অপরাধ হবে। তার ৩০ জন সহযোদ্ধা যারা গিয়েছিলেন তারা ডিসেম্বর ১৯৩৪ এ নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় লিখছেন 'স্ট্যালিন একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। তার সাথে তুলনায় পশ্চিম রাজনীতিবিদদের মনে হবে এক ক্ষয়ে যাওয়া মোমের পুতুলের মত।' তিনি কমিউনিস্ট নন। পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'যারা এমন একটা দুষ্ট এবং স্বয়ংক্রিয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ঝুলে আছে যে ব্যবস্থার একমাত্র মন্ত্র হচ্ছে ফাঁকা বুলি মিথ্যা গল্প এবং কাজকর্মের অচল পদ্ধতি। সেই সময় আইনস্টাইন বলছেন, যে সমাজ ব্যবস্থা তারা তৈরি করেছে, অন্য কোন সমাজব্যবস্থা দুর্নীতি, বেকারত্ব, শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না। সোশ্যালিজম ব্যতীত। জওহরলাল নেহেরু কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি বলছেন, সারা দুনিয়ার সমস্যা এবং ভারতবর্ষের সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে সোশ্যালিজমে।— বলছেন এই যুগটা হচ্ছে সোশ্যালিজমের যুগ। প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ বলছেন, 'আমি এরকম স্বাধীনতা চাই না যেখানে একের জায়গায় আরেকজন এসে বসবে, অথচ ধনী-দরিদ্রের কোন ফারাক ঘুচবে না। এরকম স্বাধীনতার আমার দরকার নেই। এরকম স্বাধীনতা চাই যেখানে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য চিরতরে ঘুচে যাবে।

এই গণতন্ত্রের অবশ্য পরিবর্তন হবে - যেখানে আপনাদের ভূমিকা আছে, সিপিডিআরএস-এর ভূমিকা আছে, প্রত্যেকটি নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা যদি আমরা ঠিক মতো পালন করতে পারি তাহলে প্রকৃত কাজ হবে। প্রগতির পথে সমাজ এগোবে। নির্বাচন কমিশনের একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, জাতি অথবা সম্প্রদায়ের নামে ভোটের প্রচার করা যাবে না। এমন কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া যাবে না যা বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণার জন্ম দেয় অথবা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ভোটের প্রচার করতে গিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা মিথ্যা বিবৃতি দিতে পারবেনা। প্রচারে এমন কোন বক্তব্য বলা যাবে না যাতে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারো সমালোচনা করা যাবে না। কারো সমালোচনা করতে গিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বছর বছর এইসব বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।। আপনারা কি দেখছেন গত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ১৫ লক্ষ টাকা করে একাউন্টে ঢুকে গেছে, বছরে দু কোটি করে চাকরি হয়ে গেছে। কৃষকদের রোজগার দ্বিগুন হয়ে গেছে। এগুলো তো জুমলা। নির্বাচনের আগে বলতে হয়। তাই না ! বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, দান-খয়রাতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অন্যদের নামে কুৎসা ও নোংরা কথার ফুলঝুরি বন্ধ হলে তো এদেশে ভোটই বন্ধ হয়ে যাবে! সাধের গণতন্ত্র চলবে কী করে? সকলকে সে কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে।।

[CPDRS আয়োজিত সেমিনারে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।]

উত্তরের চা-বলয় - চা-শ্রমিকের জীবন সংকট ঃ অতীত ও বর্তমান

আব্দুল মতিন আমেদ

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে বহুমাত্রিক অভিঘাত তা যেমন একদিকে প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, তেমনি অন্যদিকে তা মানবসম্পদ বিকাশের পথে এক কঠিনতম অন্তরায়। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, প্রান্তিক মানুষজনের উপর। উত্তরের চা-বলয়ের শ্রমজীবি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর অতীত ও বর্তমানের নানা অর্থনৈতিক ও অমানবিক পীড়ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই পর্যায়ভুক্ত।

উত্তরে পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে যে বিস্তৃত জনপদ বহু আদিবাসী আর নানান জনগোষ্ঠীর মিশ্র জীবন বৈচিত্র্যের যে এক অখণ্ড অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোল— সেই তরাই আর ডুয়ার্সের চা-বলয়ে চা-শিল্পের উত্থান আর চা-শিল্পের বিকাশে মূল কারিগর চা-শ্রমিকদের বেদনাময় জীবনপ্রবাহে অস্তিত্বের সংকট আর মর্যাদাহীন মানবেত্তর জীবনযাপনকে ঘিরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে নিদারুণ রূঢ় বাস্তবতা, সেই বাস্তবতাকে অতীত আর বর্তমানের প্রেক্ষিতে তুলে ধরাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

পাহাড়ের কোলে আদিগন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে অফুরান সবুজ গায়ে মেখে এই বিস্তৃত চা-বলয়ের ভূখন্ড -- আজও যেন মূল জনজীবন থেকে আর নগর সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক জনপদ।

দিগন্ত প্রসারী প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের মধ্যে-- জুড়ে আছে রাস্তার দু'পাশের গহীন বনভূমি-- কোথাও বিস্তৃত চা-বাগান,- কোথাও চাষের জমি, – ছোট ছোট জনপদ, আর তার বুক চিরে চলে গেছে- হাইওয়ে-- সাবওয়ে। গড়ে উঠেছে ছোট ছোট শহর, রিসোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, লোকালয়, বাজার, দোকানপাট আর ধাবা।

প্রতিদিন সেখানে দূর দূর থেকে আসা পর্যটকদের আনাগোনা।

উপর থেকে দেখলে মনে হবে যেন শান্ত - নিরুত্তাপ এক শীতল অতল শান্তির আবহে কাটছে তরাই ডুয়ার্সের জনজীবন। মনে হবে এখানে দুঃখ নেই, আর্তজনের হাহাকার নেই - জীবনযন্ত্রণা নেই-- ।

কিন্তু প্রকৃতির এই সবুজিয়া সারল্যের মত সাদাসিধে আদিবাসীদের জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। তার আছে অতীতের বেদনা আর বর্তমানের নিঃস্বতা, আছে- অসহায়তা আর মানবেতর জীবনের এক সকরুন জীবনগাথা।

ডুয়ার্সের শহরগুলি প্রাণোচ্ছল– গতিময়– তার আছে আধুনিকতার বহু উপাদান– যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প-কলকারখানা, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র– আধুনিক জীবনের বৈচিত্রময় বহু আয়োজন। কিন্তু শহর ছাড়িয়ে– নগরজীবনের কোলাহল ছাড়িয়ে– দূরে ঐ যে ছোট ছোট জনপদ- আর বস্তির শ্রমিক জীবন, যাদের পূর্বপুরুষদের শ্রম ঘাম রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে রচিত হয়েছে আজকের শিল্পমালিকদের এই সুজলা-সুফলা চা-শিল্পের সাম্রাজ্য, – সেই সব শ্রমজীবি, যারা আজও তরাই ডুয়ার্সের সমৃদ্ধির মূলে প্রাণশক্তি, তাদের কথাই বলছিলাম। তাদের প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

কেমন আছে এই ডুয়ার্স? কেমন আছেন তরাই ডুয়ার্সের মানুষজন? কি হাল তাদের জীবিকার? খাদ্য-বাসস্থান শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের?

বিষয়টির গভীরে যেতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে শত বৎসর আগেকার সেই দিনগুলিতে— যখন ইউরোপীয়রা — বিশেষত ইংরেজ বণিকরা এখানে এবং দার্জিলিঙে চা-চাষের পত্তন করেন। সেই যুগের ছিন্নমূল আদিবাসী চা-শ্রমিকদের উপর মালিকী নৃশংসতা— জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভূখন্ডে ঘটে চলা অমানবিক নিপীড়ন মানবাধিকার লঙ্ঘন আর বহুকাল ধরে চলা সংকটের মিথ্যে

অজুহাতে লক-আউট, ক্লোজার, ছাঁটাই আর নগণ্য মজুরীর পরিণামে— তরাই-ডুয়ার্সের বনজঙ্গলে- নদীচরে, পাথর আর বালির নীচে চাপা পড়ে আছে কত শত মানুষের হাহাকার— আর কান্না, — কে তার খবর রাখে !

চা-শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

চা-শিল্পের দৌলতে যেমন সন্নিহিত অঞ্চলের নগরায়ন ঘটেছে, তেমনি চা-শিল্পকে আশ্রয় করে জনমানবহীন দুর্গম পাহাড়ী এলাকাগুলি আজ জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেখানকার জনবিন্যাস পাল্টেছে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নত হয়েছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির কিছু মাইলস্টোন তো অবশ্যই পেরিয়ে এসেছে উত্তরের এই চা-বলয়। কিন্তু কি ছিল এর উত্থানের পশ্চাদভুমির আদিকথা ? সেকথার সূত্র ধরে অর্থাৎ অতীতের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে-- আমরা আজকের সমস্যাগুলির উৎসমূল খুঁজতে চেষ্টা করব।

অতীতের অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকসহ - চা-শ্রমিকদের জীবনে যে শোষণ, বঞ্চনা আর অমানবিক নিষ্ঠুর পীড়ন ছিল তার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক আমলের একাধিপত্য, আইনকানুন- বর্জিত এক নৈরাজ্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি মালিকেরা তাদের পুঁজি সঞ্চয়নের প্রথম যুগের নির্বাধ শোষণের অনুকুল পরিবেশে সম্ভব করেছে। সেটা ছিল বহির্দেশীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শোষণ ও উৎপীড়ন। তখন এদেশের মানুষকে শাষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবার আইন তারাই রচনা করত। ফলে সেই সময়ের সাপেক্ষে আজকের যুগের শোষণ আর পীড়নের যখন তুলনা করতে যাই, - তখন বহির্দেশীয় কিংবা দেশীয় এই উভয় পুঁজির শোষণমূলক চরিত্রের একটা সমমাত্রিক সাযুজ্য যেমন খুঁজে পাই, তেমনি অপরদিকে আবার স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি থাকা অবস্থায় এই দুই যুগের শোষণ ও পীড়নের মধ্যেও একটা মিল খুঁজে পাই। সুযোগ অবারিত হলে কোনো পুঁজিই যে তার শোষণ ও পীড়নের মাত্রাকে হ্রস্বতর করে না, তার প্রমাণ মিলছে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রের চা-বলয়ে।

শ্রমিক আইন, মজুরী আইন, ফ্যাক্টরী আইন এবং সেইসঙ্গে নানা গণতান্ত্রিক অধিকার থাকা সত্বেও শ্রমজীবিদের উপর প্রায় একই ধরণের শোষণ পীড়ন ও বঞ্চনার অভিঘাত দেখে বহু প্রশ্ন সামনে চলে আসে।

আজকের উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের যে ক্ষয়িষ্ণু চিত্র আমরা দেখতে পাই এবং চা-শ্রমিকদের জীবনের যে করুণ ছবি দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে বিশ্বায়নের সংস্কার চালিত মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসব। এখন তাকাবো ইতিহাসের দিকে। কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য কে ভিত্তি করে এই চা-শিল্পের বিকাশের ধারা ও পুঁজির নির্মম শোষণের চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করব।

চা-চাষ প্রথমে শুরু হয়েছিল চীনে। ব্রিটেনসহ সমস্ত ইউরোপে চীনের চা একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছিল। উনবিংশ শতক ছিল ইংরেজ বণিকদের সুবর্ণ যুগ। ভারতের উপনিবেশ থেকে ক্রমাগত বিপুল পরিমানে সম্পদ নিষ্কাশন করে তারা ভারতকে তাদের শোষণের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। সে সময়ে তারা তাদের সমস্ত উপনিবেশ থেকে বাণিজ্যিক শোষণের তথা মুনাফা আহরণের সমস্ত সম্ভাবনার দিকগুলি খতিয়ে দেখতে ব্যস্ত। তারা শিল্পের কাঁচামালের র জন্য আবিস্কার করছে নতুন নতুন জায়গা, সন্ধান করছে নানা কৃষিক্ষেত্র।

১৮২৩ সালে ইংরেজদের কাছে খবর পৌঁছল যে আসামের এক বিস্তৃত অঞ্চলে চা-চাষ হচ্ছে। দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলেন ইংরেজ বণিক রবার্ট ব্রুস। তিনি দেখা করলেন আসাম-রাজার উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি মনিরাম দত্ত বড়ুয়ার সাথে। মনিরাম বড়ুয়া জানতেন কোথায় চা-চাষ হচ্ছে এবং এও জানতেন যে সিংপো (Singpo) নামক জনগোষ্ঠীর মানুষ সেই চা-চাষের সাথে যুক্ত। মনিরাম বড়ুয়া সিংপোদের নেতা 'বম' এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ব্রুসের। আর এই সিংপো নেতা 'বম' এর সাহায্যেই রবার্ট ব্রুস সংগ্রহ করলেন চা-এর বীজ। (১')

সে সময়ে (১৮৩৪) ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। তিনি ভারতে চা শিল্পকে তাদের একটি অতি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করবার জন্য— এদেশে চা-পানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, এবং চা-চাষের সমস্ত সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখা — পরিকল্পনা করা এবং তার প্রয়োগে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ইংরেজ

বণিক C.A. Bruce এবং Robert Bruce-ই প্রথম আসামের চা সম্পর্কে খোঁজ পান এবং যোগাযোগ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই চা চাষের সম্ভাবনার দিকগুলো খতিয়ে দেখতে ১৮৩৪ সালেই একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির ইতিবাচক রিপোর্টের ভিত্তিতে আসামে চা-চাষের ও চা-শিল্পের লাভজনক ভবিষ্যত চিন্তা করে প্রবল উৎসাহী হয়ে ওঠে ইংরেজ বণিকরা। ১৮৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তৈরী হয় 'আসাম টি কোম্পানী'। আসামে চা-চাষের যোগ্য সমস্ত জমি ধীরে ধীরে গ্রাস করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। আসামের চা-শিল্প খুব দ্রুত একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে ওঠে অল্প কয়েক বছরেই। এইজন্য তারা আরো উৎসাহী হয়ে ওঠে ভারতের প্রান্তিক জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে চা-চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। যেহেতু বিশ্বজুড়ে তখন চা-এর কদর বেড়েছে, বিদ্যুত গতিতে চা এর চাহিদা বাড়ছে এবং চীন এককভাবে চা-শিল্পের একচেটিয়া আন্তর্জাতিক বানিজ্য করে যাচ্ছে,— তাই ইংরেজ বণিকরা ঐ আকাশস্পর্শী মুনাফার দখল নিতে মরীয়া হয়ে উঠল।

মূলতঃ ক্যাম্পবেলের প্রচেষ্টাতেই দার্জিলিং এ প্রথম চা-চাষের সূত্রপাত ঘটে। সেকথা O. Malley 'র ঐতিহাসিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়। তিনি বলছেন — "The establishment of the industry in Darjeeling is due to the.enterprise of Dr. Campbell who was appointed superintendent of Darjeeling at a time when attention was being attracted to the possibility of starting and development of the cultivation and manufacture of tea in the territories .... In 1840 Dr. Campbell was transferred from Katmandu to Darjeeling – and there started the experimental growth of tea. .. " (২)

সে সময় দার্জিলিং ছিল জনমানবহীন। গভীর অরণ্যবেষ্টিত এবং ঘন জঙ্গলাকীর্ন ঐ অঞ্চল ছিল বিষধর সাপ, নানা বিষাক্ত কীট, ম্যালেরিয়ার মশা, পোকামাকড়, জন্তু জানোয়ারে পূর্ণ। ঐ দুর্গম এলাকায় চা-চাষ ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এক অভাবনীয় বিষয়। জনবসতিহীন অরণ্যাবৃত এই বিপদ সংকুল পাহাড়ী এলাকা সমতল থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। এই দুর্গম এলাকাকে জঙ্গলমুক্ত করে চাষের জমিতে পরিণত করবার অসম দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করেছিলেন নেপালী শ্রমিকেরা। বাইরের থেকে আগত এই নেপালী শ্রমিকদেরকেই বাধ্য করেছিলেন ক্যাম্পবেল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করে চাষযোগ্য করে তুলতে। এই কাজ করতে গিয়ে কত শ্রমিকের যে মৃত্যু ঘটেছে সে তথ্য আজও অজানা। এখানে স্থানীয় লেপচা বা ভুটিয়ারা কাজ করত না বলে জানা যায়। নেপালি শ্রমিকদেরকে পাহারা দিয়ে রাখা হত। পলাতক শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত ছিল ভয়ংকর শাস্তি। মৃত্যুদন্ডও অস্বাভাবিক ছিল না। এইসব শ্রমিকদের মজুরী ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কম, অস্তিত্ব-নির্বাহী মাত্রার চাইতেও কম। বছরের পর বছর শ্রমিকরা নারী শিশুসমেত সপরিবারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে— উদয়াস্ত অমানুষিক কষ্ট করে ও ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে ঐসব দুর্গম এলাকাকে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বর্গে পরিণত করেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে আনা হত। একসময় ২৪ পরগণা এবং তৎসংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম এলাকায়— যেভাবে রাজা জোতদার জমিদাররা আদিবাসী সরল মানুষজনকে জমি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে সাপ কুমির মশার বিরুদ্ধে লড়াই করে জমি উদ্ধার করতে লাগিয়েছিল এবং কাজ হাসিলের পর তাদেরকে ভাড়াটে সৈন্য বা লেঠেলদের দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই একই প্রতারণার ঘটনা ঘটেছিল ঐ এলাকায় চা-শ্রমিকদের সঙ্গে। কিন্তু সেটা ছিল উপনিবেশের যুগ।

সেই সময়ের সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনাধীন ভারতে মানুষের জীবন জীবিকা — সবই ছিল ব্রিটিশদের হাতে।

যাই হোক, এরপর প্রথমে ১৮৪০-৪১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এবং ১৮৫২ সালে দার্জিলিঙে বাণিজ্যিক উদ্দ্যেশ্যে চা-চাষের সূচনা হয়। তবে হান্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫৬-৫৭ সালে দার্জিলিঙে চা-চাষের সূত্রপাত ঘটে।

দার্জিলিঙ এবং সন্নিহিত এলাকা ছিল Waste-Land Rules এর আওতাভুক্ত এবং plantation act এর বাইরে, সেই কারণে, চা-মালিকরা ইচ্ছেমত জমিগুলির দখল নেয় এবং অবাধে চাষের সুযোগ পায়। ক্রমবর্ধমান চায়ের চাহিদা

মেটানোর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে উৎপাদন বৃদ্ধির, আর বাড়তি উৎপাদনের জন্য দরকার হয় আরও জমির। সেই কারণেই চা-চাষ নেমে আসে তরাই-ডুয়ার্সে।

তরাইয়ে নিউ-চামটা ও মাটিগারা চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। ডুয়ার্সে চা-চাষ শুরু হয় ১৮৭৪ সালে গাজলডোবায়; উদ্যোগপতি ছিলেন ডঃ ব্রুহাম।

উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তিক এলাকাগুলিতে বংশানুক্রমিকভাবে বসবাসকারী বহু জনজাতিকে এদেশীয় বণিক ও ইংরেজ বণিকেরা তাদের লাভজনক চা-শিল্পের জন্য জমির বিস্তার করতে গিয়ে উচ্ছেদ করে। ১৮৬৬ সালের আগে দার্জিলিঙ ছিল Non-regulated অঞ্চল। ১৮৫৯ সালে দার্জিলিঙ এর Waste Land rules চালু হয়। সেই সুযোগে ঐ অঞ্চলে ইংরেজরা জমি নীতি ও জনবিন্যাসের নীতি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে তৈরী করতে থাকে আর সেগুলির প্রয়োগও খুব সহজেই হয়ে যায়।

এভাবে বেশী লাভজনক চা-চাষের প্রয়োজনে বহু আদিবাসী প্রান্তিক ও প্রতিরোধহীন (marginalized and vulnerable) মানুষজনকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে, বহু কৃষিজমিকে চা-চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তরাই ডুয়ার্সের চা-বাগানে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল একদল 'আড়কাঠি, যারা ছোটনাগপুর, মানভুম, রাঁচি, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, সিংভুম প্রভৃতি অঞ্চলের কর্মহীন শ্রমজীবিদেরকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসত। কারণ এরা ছিল বেশীর ভাগই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শিকার। তাই এই কর্মহীন, উৎখাত অসহায় মানুষগুলি ছিল অতিমাত্রায় শোষণযোগ্য ও বিরোধহীনভাবে পীড়নযোগ্য।

তবে চা- শিল্পকে কেন্দ্র করেই জলপাইগুড়ি এবং তৎসংলগ্ন বহু অনধ্যুষিত এলাকা দ্রুত জনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির যে অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সে সময়ে ঘটেছিল তার মূলে ছিল চা-শিল্পের মত একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের বিস্তার। বস্তুতঃ তরাই ডুয়ার্সে ১৮৭৬ সাল থেকে চা-শিল্প ব্যাপক আকারে বিস্তারলাভ করতে শুরু করে। ১৮৭৬ সালে বাগানের সংখ্যা ছিল ১৩টি, সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯০১ সালে মাত্র ২৫ বছরে দাঁড়ায় ২৩৫টি।(৩) চা-বাগানের বিস্তৃতির সাথে সাথে দরকার হয়ে পড়ে প্রচুর শ্রমিক। আর সস্তা মজুরীর আর সহজেই শোষণযোগ্য শ্রমিকদের সন্ধানে এজেন্টরা আন্তরাজ্য সন্ধান চালাত।

প্রথমদিকে মূলতঃ নেপালীরা এবং পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকের শেষের দুই দশকে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, সিংভূম, ওড়িষ্যা, রাঁচি, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গা থেকে শ্রমিক আনা হয়েছিল। এরা সীমাহীন শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার হত এবং অত্যন্ত কম মজুরীর কারণে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হত। মালিকরা এইসব ভিনদেশী উৎখাত হয়ে যাওয়া সংঘশক্তিহীন শ্রমিকদেরকেই কাজে নিয়োগ করতে চাইত। স্থানীয় শ্রমিকদেরকে তারা কাজে নিতে চাইত না। কারণ স্থানীয়রা মালিকি শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে সংগঠিত হতে পারে সেই আতঙ্কে মালিকরা স্থানীয়দেরকে এড়িয়ে চলত। যাই হোক ভিনদেশী শ্রমিকদেরকে দিয়েই তখন সমস্ত জায়গায় চা বাগানের কাজ হত। একে একে তরাই-ডুয়ার্সের বহু জায়গায় গড়ে ওঠে চা-তালুক। ১৮৭৫ সালে ফুলবাড়ী, ১৮৭৬ সালে বাগরাকোট, ডালিমকোট, ১৮৭৭ সালে এলেনবাড়ী, বৈস্তাবাড়ী চা-বাগান গড়ে ওঠে। (৪)

১৮৫৬ সালে কার্শিয়াং এর আলুবাড়ী চা-বাগান ও ১৮৫৭ সালে মকাইবাড়ী চা-বাগান গড়ে ওঠে। (৫) ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত গড়ে উঠেছে চামুচি টি কোম্পানী (১৮৮১), নর্দান বেঙ্গল টি কোম্পানী (১৮৮২), গুরুজংঝোড়া টি কোম্পানী (১৮৮২), আঞ্জুমান টি কোম্পানী (১৮৮৯), কাঠালগুড়ি টি কোম্পানী (১৮৯৫) , চুনিয়া ঝোড়া টি কোম্পানী (১৮৯৬), আটিয়াবাড়ী টি কোম্পানি (১৯০০), এরপর রামঝোড়া, দেবপাড়া, ও ডায়না টি কোম্পানী যথাক্রমে ১৯০৭, ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে গড়ে ওঠে। (৪)

বিংশ শতকের প্রথম থেকেই আরও ব্যাপকভাবে জোতদার জমিদারদের জমিতে গড়ে ওঠে চা-বাগান। চা- শিল্পে অভাবনীয় মুনাফার আকর্ষণ এবং নির্বাধ শ্রমিক শোষণের সুবিধা থাকায় —এই দুই-ই বণিক শ্রেণীকে উৎফুল্ল করে তোলে। এরপর গড়ে ওঠে সুকনা টি কোম্পানী, ভোজ নারায়ণ টি কোম্পানী, লক্ষীকান্ত টি কোম্পানী প্রভৃতি। শহরের বিত্তবান বাঙালী শিল্পপতিরা ধীরে ধীরে বহু চা-বাগানের মালিক হয়ে ওঠে। চা-শিল্পে জোয়ার আসে।

১৯৯৩ সালে যেখানে — 'দার্জিলিঙ, তরাই ও ডুয়ার্স মিলে মোট চা-চাষের জমি ছিল ১০০৪৮৯ হেক্টর,- সেখানে ২০০২ সালে সেই চা-চাষের জমি বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯৪০০ হেক্টর অর্থাৎ ৯ বছরে মোট চা-চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে যায় ৮৯৪ হেক্টর। আবার উৎপাদন ১৯৯৫ সালের ১৫৭৫২২ টন থেকে বেড়ে ২০০৩ এ দাঁড়ায় ২০২৫৯৮ টন। (৫)

১৮৭৬ সালে জলপাইগুড়ির বাগানের সংখ্যা ছিল ১৩টি, চা-চাষের এলাকা ছিল ৮১৮ একর এবং উৎপাদন ছিল ২৯৫২০ পাউন্ড। ১৯৩১ সালের নাগাদ সেই বাগানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫১ টি, চা চাষের এলাকার আয়তন দাঁড়ায় ১৩২০৭৪ একর, এবং উৎপাদন বেড়ে হয় ৬,৬৪, ৪৭, ৭১৫ পাউন্ড। (৬)

ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা-চাষে বাঙালী উদ্যোগপতিরাও ক্রমে তাদের বিশাল মালিকানা গড়ে তোলে। মুনাফা বাড়ছিল আকর্ষণীয় হারে। তরাইয়ে সুকনা, খড়িবাড়ী , ফুলবাড়ী নকশালবাড়ী, চাঁদমনি, শিমুলবাড়ী, দাগাপুর-- এইসব এলাকায় ইংরেজ বণিক ও বাঙালী ব্যবসায়ীরা সমান তালে চা শিল্পের ব্যবসা করে গেছে। আলিপুরের বহু ব্যবসায়ীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে পাইটকাপাড়া চা-বাগান, মরাঘাট চা-বাগান প্রভৃতি।

তবে দার্জিলিঙের চা ব্যবসায় কেবল ইউরোপীয়রাই সমস্ত ক্ষেত্রের একচ্ছত্র মালিক পরিচালক ও ব্যবসায়ী ছিল।

চা-চাষের ক্ষেত্রে বিপননের রীতিনীতি ছিল অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের থেকে আলাদা।

বিপননের সাধারণত মূল দুটি ধরণ হল --: ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিক্রী এবং অকশন সেল। অকশনের অনেক কেন্দ্র ছিল। তবে সেগুলিতে সব ক্ষুদ্র চা-চাষী বিক্রীর সুযোগ পেত না।

চা-বিপননে সুবিধা ভোগ করত সেইসব চা-শিল্পের মালিক যাদের নিজস্ব চা-ফ্যাক্টরী ছিল। তারা চা-পর্ষদ নির্ধারিত দামেই চা বিক্রী করতে পারত। উপরমহলে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবও ছিল। ক্ষুদ্র চা- চাষীরা যখন বটলীফ ফ্যাক্টরীতে তাদের কাঁচা চাপাতা বিক্রী করতে যেত তখন ঐ বটলীফ ফ্যাক্টরীগুলী পরিকল্পিতভাবে ক্ষুদ্র চা-চাষীদেরকে পর্ষদ-নির্ধারিত দামের চাইতে অনেক কম দাম দিত। ঐ বটলীফ ফ্যাক্টরীগুলি ছিল বড় শিল্পপতির অধীন। কম দাম পেয়ে লোকসানগ্রস্থ হয়ে অনেক ক্ষুদ্র চা-চাষীরা তাদের চা-চাষ বন্ধ করে দেয় এবং বড় চাষীদের কাছে তাদের চা-জমি বিক্রী করে দেয়। এটাই ছিল বড় চাষীদের প্রত্যাশা। বড় চা-চাষী ও ছোট চাষীদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা ছিল। সেই প্রতিযোগিতায় অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রের মতই চা-শিল্পে মাৎসন্যায় চলে, পরিণতিতে বেহাত হয়ে যায় ক্ষুদ্র চা-চাষীর মালিকানাস্বত্ব। বিশ্বায়নের পর আরও শক্তিশালী হয়েছে এই মাৎসন্যায়।

চা-শ্রমিকের দুরবস্থা : অতীত ও বর্তমান--

দার্জিলিঙ এর চা-বাগানে কাজ করত মূলত নেপালীরা। তরাই ও ডুয়ার্সে কাজ করত দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে আনা শ্রমিকেরা। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এইসব শ্রমিকদের সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত থাকত মালিকের একদল এজেন্ট । এরা উড়িষ্যা, বিহার, সিংভুম, রাঁচি, মধ্যপ্রদেশ, এরকম বহু জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ হত। ভালো মজুরী, স্বচ্ছল জীবন, পরিবার প্রতিপালনের স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তারা উত্তরের এইসব চা-বলয়ে চলে আসত।

১৮৭৪ সালে দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি উত্তরের এই দুই জেলায় মোট ১২৫ টি চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৪০০০ জন, ১৯১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৯৬০৬ জন। ওরাঁও ৫৫ হাজার, মুন্ডা ১৭ হাজার, সাঁওতাল ১১ হাজার এবং নেপালী ১৯ হাজার। (৭)

চা-শিল্পের পত্তন ঘটায় একসময়ের প্রান্তিক অনুন্নত এইসব এলাকার যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন ও নগরায়নের ফলে আধুনিক জীবনে গতিসঞ্চার হয়। তবে মালিকদের বিপুল মুনাফা আর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশাপাশি আজও রয়ে গেছে দারিদ্র পীড়িত শ্রমিকের হাহাকার। চা-শিল্পের ক্রমবিকাশের এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এলাকায় উদ্ভব ঘটেছে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং মুষ্টিমেয় বিত্তবান শ্রেণীর। জন্ম নিয়েছে ধূর্ত ও মতলবি এক শ্রেণীর দালাল চক্র, কমিশন এজেন্ট, পাচারকারী। কমবয়সী সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ চা বাগানের মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে টাকা উড়ছে — সেই

টাকার গন্ধে পাচারের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

অন্যদিকে পড়ে থাকছে দিনপ্রান্তের ফ্যাকাশে আলোয় উনপাঁজুরে শ্রমিকের হতশ্রী জীবনের সকরুণ জীবনগাথা। শ্রম, ঘাম, রক্ত ঢেলে আর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন দুমড়ে মুচড়ে মালিকের আকাশছোঁয়া মুনাফা যোগালো যে শ্রমিকেরা তাদের জীবনে কেবল অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাস।

সামন্তী শোষণের ফলে ক্ষুদ্রচাষী, প্রান্তিক চাষীরা যেমন স্বত্বাধিকার বিলোপের মধ্য দিয়ে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছিল, পুঁজিবাদের উন্মেষে যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য মানুষ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল,— ঔপনিবেশিক শোষণে মানুষ হয়ে পড়েছিল ছিন্নমূল এবং ভিখিরী,— তেমনি চা-চাষের জমি উদ্ধারে জীবনক্ষয়ী লড়াই করে সারাজীবনের সমস্ত তেজ, বীর্য নিঃশেষ করে, ক্লান্তিহীন শ্রমের মধ্য দিয়ে যারা চা-শিল্পকে আজকের রূপে নিয়ে এল তারা হয়ে পড়ল সমাজের সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সবচেয়ে অপাক্তেয় এবং সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণী।

চা-চাষের প্রাক্কালে শ্রমিকেরা গহীন জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদ সংকুল অঞ্চলে বিষাক্ত সাপ, জন্তু-জানোয়ার, বিষাক্ত কীট, পোকামাকড়, মশা, এবং মারণঘাতী ব্ল্যাক ওয়াটার ফেভার-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে গভীর বনজঙ্গল কেটে সাফ করে কীভাবে মুনাফালিপ্সু মালিকদের জন্য চা-চাষের জমি মুক্ত করেছিল— শ্রমিকদের সেই জীবনক্ষয়ী সংগ্রাম ক'জনই বা মনে রেখেছে! কেবল ক্যাম্পবেল, ব্রুস এরাই বিখ্যাত হয়ে থাকছে ইতিহাসে। এই মহাজনী সভ্যতার পরিহাস এই যে, যারা এই চা-শিল্পের মূল উৎপাদনী কারিগর সেই শ্রমিকদের হতাশাজনক কম মজুরীর কারণে তাদেরকে বনজঙ্গলের অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। তাদের জন্য না আছে ভালো মজুরী, না আছে পর্যাপ্ত খাদ্য, না আছে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, না আছে সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল, না আছে আধুনিকতার জীবনের বিজ্ঞানসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা। চিকিৎসা কিংবা শিক্ষা আগের থেকে উন্নত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাক ওয়াটার ফেভার-এ বহু শ্রমিকের মৃত্যু হত। কেবল অপুষ্টি, অর্ধাহার, রক্তশূন্যতা, অকাল বার্ধক্য, আর অকাল মৃত্যুই তাদের পরিণাম। কিন্তু মালিকরা শ্রমিকদের জীবনের কোনো তোয়াক্কা করে না। কেবল মুনাফাবৃদ্ধির যত কৌশল আছে সেসবের সুলুক সন্ধানই মালিকদের কাজ। আর সেজন্যই সস্তা শ্রমের লোভে মালিকেরা চা-বাগানে বেশী বেশী নারী শ্রমিক ও শিশু শ্রমিক ব্যবহার করে।

মুনাফার উদগ্র লালসা চা-মালিকদের শোষণের বন্দোবস্তকে আরো নির্মম করে তুলেছিল। বাসস্থান যেন এক একটি খুপড়ী। এক একটি খুপড়ীতে ৮/৯ জন পরিবারের সদস্য একসঙ্গে থাকতে বাধ্য হত। ১৯১৫ সালে প্রণীত ইনডেনচার সিস্টেম অফ লেবার এবং ১৯২৫ সালের ওয়ার্কম্যানস ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এই দুটি আইনের ধারা তৈরী করা হয়েছিল চা-শ্রমিকদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবার জন্য। মনোহর তিরকি তার জলপাইগুড়ির আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে লিখেছেন–- ''মেমসাহেবরা শ্রমিকদের শরীরকে গুলির নিশানা তৈরীর চাঁদমারীও নাকি করতেন।(৮) গ্রীষ্মের দাবদাহে তরাই ডুয়ার্সে চা-শ্রমিকের জীবনযন্ত্রণা শতগুণ বেড়ে যেত। অত্যাচারের কাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে ব্রিটিশ চা-মালিকদের নারী নিগ্রহের ঘটনা। চা বস্তীর মেয়েরা বরাবরই মালিক সাহেবদের যৌন লালসার শিকার হত।

পুঁজি সঞ্চয়নের প্রথম যুগে যেমন শ্রমজীবি মানুষকে পুঁজিমালিকরা মানুষ হিসেবেই গণ্য করত না, সেই ধারাটা গণতন্ত্রের আর মানবাধিকার আইনের কল্যাণে মাঝখানে কিছুটা শ্লথগতিপ্রাপ্ত হলেও বর্তমানে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত উদার বাজার অর্থনীতিতে বেশ কিছুটা বেগবান হয়েছে। আসলে মালিকী সংস্কৃতির মূলেই রয়েছে ঐ জাতীয় ভেদকামী অবমানবিক চিন্তা ও সংস্কার। পুঁজি সঞ্চয়নের যুগে এবং তার ধারাবাহিক বিকাশপর্বে অন্যান্য শিল্পেও একই ধরণের নৃশংসতা ছিল। শিল্পভেদে মালিকশ্রেণীর নিষ্ঠুরতা ও লোভ পাল্টায় না।

তবে ইতিহাসের নিয়মে এবং সমাজ বিবর্তনের ধারায় মালিক শ্রমিকের এই দুঃসহ প্রতিষঙ্গের অবস্থান ক্রমাগত দ্বন্দ্বাত্মক রূপ নিয়েছে। শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করতে ও তাদের অন্তস্থ ক্ষোভকে প্রজ্জ্বলিত করে তাদের মধ্যে মানবাধিকারের চেতনা তথা স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে তাদের মধ্যে সংগ্রামী তেজ জ্বালিয়েছিল একদল সমব্যথী মানুষ, যাদের রাজনীতি ছিল শ্রমজীবিদের শোষণমুক্তির

রাজনীতি। তাদের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন। চা-শ্রমিকদের আন্দোলন দমনের জন্য স্বদেশী ও বিদেশী মালিকরা বানিয়েছিল নিজেদের ইউনিয়ন- আই. টি. পি.এ.।

শ্রমিকদের ছোট খাটো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে হতে একসময় জন্ম নেয় শ্রমিকদের সংগঠিত বৃহত্তর আন্দোলন। চা আন্দোলন (১৯০৬), টানা ভগত আন্দোলন (১৯১৬) এরকমই শ্রমিক আন্দোলন। মালবাজারে দেবপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে ৩০টি চা বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন হয় এবং চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরী হলে তখন থেকে চা শ্রমিকদের আন্দোলন একটি সংগঠিত রূপ নেয়। এর প্রভাবে চা বলয়ের সর্বত্র চাল শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। মজুরী বৃদ্ধি, বোনাসের দাবি এইসব ইস্যুতে শ্রমিক সংগঠনগুলি লেবার কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। সে সময়ে সমস্যার কোনো সমাধান তো হতই না বরং শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার আরও বেড়ে চলত। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালে গ্রামমোড় চা বাগানে শ্রমিকরা তাদের সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে ১১ দিন টানা ধর্মঘট চালিয়ে যায়। (৯)

বহু আন্দোলন, দিনের পর দিন ধর্মঘট আর ডেপুটেশনের ফলশ্রুতিতে শেষে স্বাধীন দেশের সরকার ১৯৫১ সালে বাগিচা আইন পাশ করে। বাগিচা আইনের ধারাভুক্ত যে সুযোগ সুবিধাগুলি শ্রমিকদের প্রাপ্য বলে অর্জিত হয় তা স্বাধীন দেশের সরকার চা মালিকদেরকে দিয়ে পুরোপুরি মানাতে পারেনি। ফলে শ্রমিকদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, রেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা, ছুটির সুযোগ সুবিধাকে শ্রমিকমুখী করা— এইসব সুযোগ-সুবিধা আজকের দিনে কিছুটা উন্নত হলেও পর্যাপ্তরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

এরপর আন্দোলনের প্রয়োজনেই ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়েছিল 'কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ প্ল্যানটেশন ওয়ার্কার্স'। 'দেবেন সরকার' নামে একজন রাজনৈতিক নেতা গঠন করেন 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল চা শ্রমিক ইউনিয়ন। (১০)

উক্ত কোঅর্ডিনেশন কমিটির ডাকে আবার টানা ৬ দিনের ধর্মঘট করা হয় মালিকদের শোষণ বঞ্চনা আর নিপীড়নের প্রতিবাদে। এই ধর্মঘটকেও দেশীয় চা-মালিকরা গ্রাহ্য করে না। এরপর ''কাদের নওয়াজ কমিটি''র চা-শ্রমিকদের নানা সমস্যা ও দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি রিপোর্ট ও সুপারিশ তৈরী করে। মালিকপক্ষ তা না মানলে কোঅর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে আবার ধর্মঘট ডাকা হয়। এই ধর্মঘটে সামিল হয় উত্তরের সমস্ত চা-বাগানগুলির শ্রমিকেরা। ১৭ দিন ধরে সেই ধর্মঘট চলে। (১১) এরপর একের পর এক চা-শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং আন্দোলন সংগঠিত হয়।

২০১৩ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে উত্তরবঙ্গের ২৭৩টি চা-বাগানের কর্মরত আড়াই লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে ৯৫,৮৩৫ জন শ্রমিক কোনো আবাসন পায়নি। আর এইসব চাবাগানের মধ্যে মাত্র ১০৭টি চা-বাগানের চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা আছে। ২৭৩টি চা-বাগানের মধ্যে ৬১টি চা-বাগানে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। বিদ্যুত সংযোগ নেই প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক আবাসনে। ঐ বাগানগুলির মধ্যে ৪২টিতে পর্যাপ্ত স্কুল গড়ে তোলা হয়নি। ১৮টি চা-বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরী থেকে কেটে রাখা পি. এফ. এর টাকা জমা করেনি এবং ৪৬টি চা-বাগানের মালিক শ্রমিকদেরকে কোনো গ্র্যাচুইটি দেয়নি। (১২)

স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পরেও সংবাদে বারবার উঠে আসে চা-বাগানগুলির করুণ চিত্র। চা-মালিকদের বিপুল মুনাফা সত্বেও চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান খুব বেশী উন্নত হয়নি। এখনো অপুষ্টি, রক্তাল্পতাজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর অকালমৃত্যু ঘটেই চলেছে। কর্তৃপক্ষ সব জেনেও না জানার ভান করে নির্বিকার। একপক্ষে রয়েছে মালিক, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এবং সরকার। এই ত্রয়ীর মিলিত বোঝাপড়াই চা-শ্রমিক থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের শ্রমজীবিদের শোষণ ও বঞ্চনার হার বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। একসময় চা-শ্রমিকদের মজুরি ৬৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২০ টাকা করবার দাবি উঠেছিল একবার। এই অতি সামান্য মজুরির দাবিটির গ্রাহ্যতা নিয়ে বহুবার বৈঠক হয়েছিল মালিক, ইউনিয়ন আর সরকারের। কিন্তু শেষে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ঐ মজুরি ৯৫ টাকায় পৌঁছায়। বর্তমানে

সাধারণ চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি ২৩২ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫০ টাকা। তবে বাগানের গ্রেড ভেদে (গ্রেড — A, B, C) মজুরির তারতম্য হয়। আবার স্থায়ী কর্মী ক্যাজুয়াল কর্মীদের মজুরির মধ্যে ফারাক থাকতে পারে বাগানভেদে। বটলীফ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের বেতন তুলনায় একটু বেশী (কোথাও ৩০০ টাকার সামান্য উপরে)। চা-শ্রমিকরা ২০১৬ সাল থেকে অন্ত্যোদয় যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা রেশন পায় এবং সরকারী ভর্তুকির পাশাপাশি কিছু মালিকি ভর্তুকিও আছে।

তবে শ্রমিকদের নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে, মালিকী বদান্যতায় নয়। এ কথাও শোনা যায় যে মালিককে বহু ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাজির করাতে পারে নি সরকার। মালিকের কাছেই যেতে হয়েছে ঐ দুই পক্ষকে। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মালিকশ্রেণী প্রমাণ করতে চায় যে শ্রমজীবিদের শ্রমের তুলনায় মালিকের পুঁজির কৌলীন্য --- দক্ষতা ও যোগ্যতার বিচারে অনেক বেশী। তাই পুঁজিই হল অর্থনীতিতে নির্ণায়ক শক্তি। অথচ যন্ত্র মূলধন থেকে পরিকাঠামো, বীজ বপন, প্ল্যানটেশন থেকে শুরু করে খোদ চা উৎপাদনের কাজ শ্রমজীবিদের শ্রম ছাড়া সম্ভব নয়। মালিকের যন্ত্র মূলধন বা উৎপাদনের উপকরণ হল ব্যয়িত শ্রম (expended Labour/dead Labour), আর মালিক যে পণ্য বিক্রী করে মুনাফা উপার্জন করে সেই পণ্যও উৎপাদন করে তাজা শ্রম (living labour) ও ব্যয়িত শ্রম মিলিতভাবে। পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভব করে তোলে শ্রমিকরা, পুঁজি নিজেই নিজেকে বৃদ্ধি করতে পারে না। অর্থাৎ যন্ত্র মূলধন তার ব্যবহারকালীন সময়ব্যাপী তার ক্রয়মূল্য স্থানান্তরিত করে চূড়ান্ত পণ্যের মূল্যে (অর্থাৎ যন্ত্রমূলধন দৈনিক মোট ব্যবহারিক মেয়াদ ÷ ক্রয়মূল্য পণ্যে যুক্ত হয়)। আর কাঁচামাল সরাসরি তার মূল্য স্থানান্তরিত করে চূড়ান্ত মূল্যে, ফলে স্থির মূলধন (ConstantCapital) বা যন্ত্র মূলধন ও কাঁচামাল তাদের যা মূল্য তা সরাসরি উৎপন্ন পণ্যে স্থানান্তরিত করে বলে তারা কোনো বাড়তি মূল্য তৈরী করে না। বাড়তি মূল্য তৈরী করে শ্রমিক, তার শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় মজুরী-দ্রব্যের মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য সে তার উৎপাদনক্রিয়ায় তৈরী করে। সেই বাড়তি মূল্যই হল উদ্বৃত্ত উৎপাদ যা মালিক বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে ঐ শ্রমজীবিদের আয় থেকেই আবার উপযোজন করে। শ্রমশক্তিই একমাত্র উৎপাদনের উপাদান যা তার ব্যবহারকালে নিজের পুনরুৎপাদন ব্যয়ের চাইতে বেশী মূল্য তৈরী করে। যন্ত্র লিভারের মত কাজ করে শ্রমের উৎপাদনশীলতার হার বাড়ায়। অর্থপুঁজি একটা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটির খোদ উৎপাদনে কোনো ভূমিকা নেই। যখন অর্থ ছিল না, মানবসভ্যতার সেই স্তরেও উৎপাদন হয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি উপাদান হিসেবে কোনো বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে না। যাই হোক সেই গূঢ় মূল্য তত্বের ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কেবল এইটুকুই প্রতিপন্ন করা দরকার যে মালিকের পুঁজি ও মুনাফার উৎস হল শ্রমিকের শ্রম। তাই পুঁজি নিয়ে এত আস্ফালন ও ঔদ্ধত্য শূণ্যগর্ভ।

আবার সেই শ্রমিকদের দুর্দশার বারোমাস্যাতে ফিরে আসা যাক।

চা-বলয়ের চা-শ্রমিকরা তাদের বিপন্ন অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে ভিন রাজ্যে যেখানে কিছু রিয়েল এস্টেটের নির্মাণ চলছে , যেখানে গণসম্পদ বেসরকারীকরণের পর সেখানে নানা ধরণের পরিকাঠামো ও দখলীস্বত্বের নিদর্শন রূপে গড়ে উঠছে নানা ইমারত। তবে সেই কাজগুলিও এখন শেষের দিকে। । যারা বেকার তাদের অতি নগণ্য মজুরীতে নানা শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়। চরম দুর্বিপাকে পড়ে চা-বলয়ের কমবয়সী ছেলেরা বালি তোলে, পাথর তোলে বালি খাদান থেকে। একশ্রেণীর নির্মাণ- সামগ্রী ব্যবসায়ী বৈধতা-অবৈধতার তোয়াক্কা না করে — নদীর গতিপথ ও নদীপাড়ের বাঁধনের দুর্বলতার কথা শিকেয় তুলে ঐসব চা-শ্রমিকদের ছেলেদেরকে খুব কম মজুরীতে কাজ করাচ্ছে। লরীতে বালি ও পাথর ভরাতে খুব নগণ্য মজুরী দিচ্ছে। এই চরম বঞ্চনা গরীব মানুষকে সহ্য করতে হয় কারণ তার বিকল্প আয়ের পথ নেই। এমনকি এর আগে বহু শ্রমিকের পি. এফ এর টাকা পর্যন্ত মালিক আত্মসাৎ করতে সমর্থ হয়েছে, অসুবিধে হয়নি। ক্ষোভে, দুঃখে হতাশায়-দুশ্চিন্তায়-উদ্বেগে-দিশেহারা চা-শ্রমিক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে অনেক সময়। অন্যদিকে মেয়ে পাচার আরো লাভজনক ব্যবসায়

পরিণত হচ্ছে।

লেখক হরিপদ রায় লিখছেন- "... ১৮৯১ সাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তিরকাল পর্য্যন্ত শ্রমিক মজুরী বেড়েছে ৪ থেকে ৬ আনা, মহিলা শ্রমিকদের মজুরী বেড়েছে ৩ থেকে ৫ আনা ... " (১৩)

অথচ চা এর চাহিদা বেড়েছে, চা-চাষের এলাকা বেড়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, মালিকদের মুনাফা বেড়েছে বিপুল হারে। ডঃ মানস দাশগুপ্ত তার 'বিশ্বায়ন ভারত ও উত্তরবঙ্গ' গ্রন্থে "উত্তরবঙ্গে নতুন চা-বাগান ও অর্থনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন-- "চা পর্ষদ (Tea Board) তাদের এক সমীক্ষায় জানিয়েছে অন্যান্য অনেক শিল্পের তুলনায় চায়ের মুনাফা ছিল অনেক বেশী। যেমন ১৯৮৪ সালে চিনি শিল্পে মুনাফার হার ছিল ৯.৭ শতাংশ, তামাক শিল্পে ৮ শতাংশ, বস্ত্রশিল্পে ৬ শতাংশ আর চা-ব্যবসায় মুনাফার হার ছিল ৩৩ শতাংশ।" (১৪)

অনেক আন্দোলন হয়েছে অতীতে, এবং নয়া সংস্কার অর্থনীতি চালু হবার পরেও। ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন, বৈঠকের পর বৈঠক, কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে হঠাৎ বাগান বন্ধের নোটীশ- শ্রমিক ছাঁটাই-- মালিক বদল।

চা-শিল্পে অলীক সংকটের তত্ব উদ্ভাবন করে অনেক সময়েই মালিকরা দিনের পর দিন শ্রমিকদের মজুরী বকেয়া রেখেছে এবং হঠাৎ চা- বাগান ও চা-কারখানা বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা যায় মালিকরা শ্রমিকদের মধ্যে কর্মচ্যুতির আতঙ্ক জিইয়ে রেখে একদিকে তাদেরকে আন্দোলন থেকে নিরস্ত করতে চাইত , অন্যদিকে ঐ কাজ হারানোর আতঙ্কের দ্বারা ক্রমশ কম মজুরীতে তাদেরকে কাজ করাতে বাধ্য করাতে পারত।

চা-বলয়ে বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব-অর্থনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো শিল্প থাকতে পারে না। চা-শিল্পও তাই ব্যতিক্রমী নয়। চা-বলয়েও উদারীকরণের ও বেসরকারীকরণের প্রভাবে জমি ও সরকারী সম্পদের গণমালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে ব্যক্তি চা-মালিকের হাতে। জমির মালিকানার স্বত্বাধিকার হারিয়েছে বহু প্রান্তিক চাষী।

এসব ক্ষেত্রে কার্যকরী সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। এক মেরু বিশ্বে যখন বাজার মৌলবাদীরা সরকারী নিয়ন্ত্রণকে "হস্তক্ষেপ" (intervention) নাম দিয়ে বলছে "It is not the business of the government to be in business" এবং ফ্রান্সিস ফুকোয়ামার সেই "ইতিহাসের সমাপ্তি" শব্দবন্ধটির পুনরাবৃত্তি করে বলছে "TINA" বা 'There Is No Alternative' তখন শ্রমিকমুখী তত্ব ও আদর্শকে ব্রাত্য করে দিতে তাদের বেগ পেতে হয়নি।

যেহেতু উদারীকরণ বেসরকারীকরণের ধাক্কায় সরকারী ক্ষেত্র সহ সমগ্র অর্থনীতি চলে যাচ্ছে শিল্পমালিকের হাতে, তাই গোটা বিশ্বব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ, সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির (Dirigiste regimeó) আদর্শ, সমাজবাদী আদর্শ পদদলিত। শ্রমজীবিদের স্বার্থমুখী সব আদর্শ নিয়মকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে ব্যক্তিমালিকানার শোষণমূলক ও বৈষম্যবাদী অর্থনীতিকে একমাত্র ভারসাম্যবাহী উন্নয়নের পথ বলে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মত বর্তমানে মিল্টন ফ্রীডম্যান চালিত শিকাগো স্কুলের নিও-লিবারেলরা প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে, আর ক্ষমতাসীন দলগুলি ঘাড় নীচু করে সেগুলি মেনে চলছে। বিশ্বায়িত পুঁজিপিন্ডে চা-বাগানের শিল্প পুঁজি অন্যান্য শিল্পপুঁজি থেকে আলাদা থাকছে না। গণভাবনার অভিমুখ বদলে সেই গতিমুখকে মালিকমুখী করার কাজে সাফল্য পেয়েছে তারা। তাই অনাদর্শায়নের (de-ideolization) পথ ধরে একসময়ের সমাজবাদী চেতনার ভরকেন্দ্র আজ অনেকটাই সরে গেছে মালিকের দিকে।

উদারনীতির ফলে যেহেতু শিল্পে বিনিয়োগে কোনো বাধা রাখা যাবে না, তাই কৃষি জমি, ব্যারেজের জন্য সংরক্ষিত জমি, বর্গা জমি, সরকারী কাজের জন্য বরাদ্দ জমি – এইসব জমির উপরেও চা-মালিকসহ অন্য পুঁজিমালিকের আগ্রাসী থাবা বিস্তৃত হয়। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মানস দাশগুপ্ত তার 'বিশ্বায়ন ভারত ও উত্তরবঙ্গ' বইয়ে (পৃষ্ঠা-- ১৮২) কতগুলি প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন "(১) ট্রাইবালদের জন্য সংরক্ষিত জমি কি এত সহজে টাকা দিলে কেনা যায়? (২) কৃষিজমি কিনতে গেলে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনের আওতায় পড়ে? (৩) তিস্তা ব্যারেজের জন্য জমি

কি প্রাইভেট পার্টি ব্যবহার করতে পারে? (৪)বর্গা জমি কি মালিকরা সহজে বিক্রী করতে পারে? (৫) চা-বাগানের উদ্বৃত্ত জমি যেখানে চাষবাস হয় সেইখানে মালিকরা কি ইচ্ছামতো চাষীকে উচ্ছেদ করতে পারে? (৬) বর্ডার (Border) fencing করার জন্য জমি কি চা-বাগানে রূপান্তরিত হতে পারে?" (১৫)

চাষের জমি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে কিনে নিতে দালাল মাফিয়া চক্রের সাহায্য নেয় মালিকেরা। আর এভাবেই নিজেদের বিশাল চা-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। এর জন্য তারা নানা চক্রান্ত সংগঠিত করে। জমির মূল মালিকানা কার ছিল, কার হওয়া উচিত, এসব প্রশ্ন তুলে দিয়ে জলঘোলা করে জমিদখলের পরিকল্পনা হয়।

বিশ্বপুঁজির অংশীদার হিসেবে চা-মালিকদের পুঁজির চরিত্র ভিন্নতর হতে পারে না। এক্ষেত্রেও একচেটিয়া শিল্প গড়ে তুলবার জন্য বৃহৎপুঁজিমালিকরা উৎপাদিত চা এর কারখানা থেকে শুরু করে চায়ের দাম নির্ধারণ করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের দখল নেওয়া সবই করে থাকে। ব্রুকবন্ড, লিপটন, এই সব চা-কোম্পানী দাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে চা-অর্থনীতির গোটাটাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্ষুদ্র চা-চাষীদেরকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয় না। ফলে বছরের পর বছর চলে আধিপত্যবাদী বৃহৎ পুঁজির দখলদারী এবং ক্ষুদ্র পুঁজির অন্তর্জলী যাত্রা। অথচ সমস্ত পুঁজির সমান শোষণের অঙ্গীকার দিয়ে বলা হয় "Level Playing Field", বাস্তবে তা প্রহসন মাত্র।

সবশেষে বলা যায়, চা-বাগানের সমস্যা এবং সংকট সমস্তটাই চা-শ্রমিকের এবং তাদের পরিবারের। নারী নিগ্রহ এবং পাচার থেকে শুরু করে শ্রমিকদের নানা পাওনা না মেটানোর মালিকী স্পর্ধা এসবই সম্ভব হয়েছে-- দ্বিমেরু বিশ্বের দ্বৈত আদর্শবাহী গমনপথ, সোভিয়েতের দুঃখজনক বিপর্যয়ের পর, একমেরু গমনপথে পর্যবসিত হবার মধ্য দিয়ে। বিশ্ব রাজনীতি থেকে শ্রমজীবিদের আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তিগুলির অধঃপতন এবং বিশ্বায়নের সংস্কার অর্থনীতিতে সরকারগুলির আত্মসমর্পন হল এর প্রত্যক্ষ কারণ। এর দ্বারা পুঁজির মালিককে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, পুঁজির স্বার্থ সবার উপরে এবং পুঁজির সামনে অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি মানবাধিকার এসব বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেখানে পুঁজির জন্য সকলকে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

অতএব চা-বাগানের সমস্যা চিরতরে নির্মূল করতে হলে সেখানে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে চা-বাগানের উপর রাষ্ট্রীয় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে এবং চা-শ্রমিকরাই সেখানে সমবায় পদ্ধতিতে চা-চাষ করবে। প্ল্যানটেশন, চাপাতা উৎপাদন, কারখানায় প্রসেসিং' এর কাজ, দাম নির্ধারণ, বিপনন, রপ্তানী এসবই চা-শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার পরিচালিত বোর্ড দেখবে। শ্রমিকরা সরকারী কর্মচারীদের মত বেতন পেতে পারে অথবা চা এর মোট লভ্যাংশ তাদের শ্রমের পরিমাণের অনুপাতে বন্টন করা যেতে পারে।

উত্তরের সমস্যা শত শত বৎসরের সমস্যা। নতুন করে এখানে শিল্পায়নের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কারণ বিদ্যমান শিল্পগুলি বাজার সংকটে ধুঁকছে। আর চা-শিল্পে বাজার তেজি থাকলেও এবং মুনাফা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও চা-শিল্পের রপ্তানীতে ভারত অন্যান্য অনেক দেশের থেকে পিছিয়ে আছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে না। চা- শ্রমিকদের উদ্যোগে সমবায় চাষ বা যৌথ চাষ ই একমাত্র সমাধানের উপায়।

তথ্যসূত্র:

(১) উত্তরবঙ্গের পরিচয় আর্থসমাজ : সংস্কৃতি থেকে ভূপ্রকৃতি, --হরিপদ রায়, ছায়া পাবলিকেশন, প্রকাশক- সমীর কুমার রায়, পৃষ্ঠা-- ১২২

(২) L.S.S.Oó Mally – Bengal District Gazetteers- Darjeeling– Logos Press– Delhi 1999– p-19 < উপনিবেশায়ন থেকে বানিজ্যায়ন: উত্তরবঙ্গ, শুভময় দত্ত- পৃ- ৯৫- ৯৬ , অণিমা প্রকাশনী, প্রকাশক- শ্রীমতি অণিমা সাহা, কল-০৯

(৩) J.F. Grunning– Eastern Bengal and Assam District Gazetteers- Jalpaiguri– Pioneer press– Allahabad– 1911– p-103 < উপনিবেশায়ন থেকে বানিজ্যায়ন : উত্তরবঙ্গ, শুভময় দত্ত, অণিমা প্রকাশনী, কল-০৯, পৃ- ১০০

(৪) তদেব শুভময় দত্ত পৃ - ৯৯, অণিমা প্রকাশনী

(৫) Various issues of Tea statistics, represented by, Dibyendu Bhattacharya and Nivedita Bhattacharya– Article/ Paper - titled "Economics of Tea Industry in North Bengal - A study on its area, production, marketing– prices" published in the book " "Economy And Society of North Bengal " — Edited by - Pankaj Kumar Debnath & Subhasis Bhattacharjee– Progressive Publisher– publisher éôé Kamal Mitra– – Kol- 07 – p- 157

(৬) উত্তরবঙ্গ: অর্থনৈতিক উত্তরণ, লেখক- কৃশানু দাশ চৌধুরী, পৃ- ৫১, অণিমা প্রকাশনী, কল-০৯ < Subhajit Roy, Transformation on the Bengal Frontier- Jalpaiguri (১৭৬৫-১৯৪৮), পৃ-৭৭

Another source- J.F. Grunning– Eastern Bengal and Assam District Gazetteers– Jalpaiguri– p-103.

(৭) উত্তরবঙ্গের পরিচয় আর্থসমাজ: সংস্কৃতি থেকে ভূপ্রকৃতি-- লেখক-- হরিপদ রায়, ছায়া পাবলিকেশন, কল-৭৩, পৃ- ১৩০

(৮) তদেব, পৃ- ১৩৩

(৯) তদেব-- পৃ- ১৩৮

(১০) তদেব- পৃ-১৩৯

(১১) তদেব- পৃ ১৪০

(১২) তদেব -- পৃ- ১৪১

(১৩) তদেব - পৃ- ১৪৩

(১৪) বিশ্বায়ন ভারত ও উত্তরবঙ্গ - ড: মানস দাশগুপ্ত - পৃ- ১৮১

(১৫) তদেব- পৃ- ১৮২

[লেখক প্রাক্তন শিক্ষক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী]

মানবাধিকারের দৃষ্টিতে ভারতে শিক্ষার অধিকার আইন

মঙ্গল কুমার নায়ক

ইউরোপে নবজাগরণের মধ্যদিয়ে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতটি গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে ধর্মের আধিপত্য, সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডুকতার বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। প্রমাণ নির্ভর যুক্তিগ্রাহ্য, বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার পথ ধরে এই পরিবর্তন আমাদের দেশে এসে পৌঁছায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গান্ধীজি, প্রমুখদের শিক্ষা সংক্রান্ত মতামত দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধতা, গোঁড়ামি দূর করতে সকলের জন্য যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন সে কথা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সেদিন পরাধীন দেশের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দাবি বারে বারেই তারা তুলে ধরেছিলেন যে, শিক্ষা হবে সার্বজনীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু পূর্বেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯১০ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করেছিলেন। তবে এটাও উল্লেখ করা যায় যে, গোখলের বহু পূর্বে গুজরাটের বরোদাতে দেশীয় রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯১১ সালের বাংলা প্রেসিডেন্সির এডুকেশন অ্যাক্ট থেকে জানা যায় সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি চালু ছিল।

বহু আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৪৯ সালে সংবিধান গৃহীত হলে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির ৪৫ নম্বর ধারাতে বলা হয়, পরবর্তী ১০ বছর সময়সীমার মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আবার ৪৬ নম্বর ধারায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য দুর্বলতম সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। সংবিধানের ২১/A ধারায় "Right to Education" কে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে দেশের জনসাধারণের কাছে শিক্ষা হল মৌলিক অধিকার।

অবশ্য এর একবছর পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে এলিয়ান রুজভেল্টের সভাপতিত্বে ২১৭ নম্বর রেজোলিউশনে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) স্বীকৃত হয়। এই ঘোষণাপত্রকে পৃথিবীর ১৯৩টি দেশ সেদিন অনুমোদন দিয়েছিল। শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার প্রসঙ্গে মানবাধিকারের ২৬ নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে - ''everyone has the right to education. Education shall be free at least in elementary and foundational stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and Higher Education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

অর্থাৎ প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা হবে অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানভাবে খোলা থাকবে।

ঐ ধারার দু'নম্বর উপধারায় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে — "Education Shall be di-

rected to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedom. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all Nations, racial or religious groups and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace [(article 26 92)]

অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং উন্নয়নের প্রয়াস গড়ে তুলবে। পাশাপাশি শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কার্যাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যাতে বিশ্বজুড়ে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়।

মানবাধিকাররের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের উপরিউক্ত ধারাগুলি যাতে বিশ্বজুড়ে কার্যকরী হয় তার জন্য বলা হয়েছিল —'এই ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে দেশগুলি পাঠদান এবং শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্ত ভূখণ্ডের জাতিসমূহর, উত্তরোত্তর জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতার সময়ের সার্বজনীন অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য স্বীকৃতি আদায় ও যথাযথ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।

আমাদের দেশের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ থাকলেও দেশের জনসাধারণের কাছে তা যে অধরাই থেকে গিয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৬ সালের কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে। ''কমিশনের শিক্ষা এবং জাতির উন্নয়ন"(Education and National Development) সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নন-এনরোলমেন্ট, অনুত্তীর্ণতা, ড্রপ আউট সমস্যাগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শিক্ষা পদ্ধতির, পাঠক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের সুপারিশ করে সরকারের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি (First National Education Policy) গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ নীতিতে বলা হয়েছিল ধর্ম, জাতি, লিঙ্গভেদে সকলেই রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা পাবে।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ৬-১১ বছর বয়সের এবং ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ১১-১৪ বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত শিশুর শিক্ষার কর্মসূচি রাষ্ট্র সেদিন গ্রহণ করেছিল। তবুও একথা উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালের মধ্যেও সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় সার্বজনীন শিক্ষার যে দাবি ছিল সেটাকে তখনও সম্পূর্ণ কার্যকরী করা যায়নি। ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে (Second National Education Policy 86) তা স্বীকার করেই প্রাথমিক শিক্ষায় Universal Access Universal Enrolment এবং Universal Retention নীতি নেওয়া হয়। তবে দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার আগেই ১৯৭৯ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদনে কমন স্কুল সিস্টেমের দ্বারা গুণগত মানের উন্নত প্রারম্ভিক (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা অর্জন এবং অভিন্ন নিয়ম ও বেতনের সুপারিশ করা হয়। এর দ্বারা সমস্ত শিশুদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে (Neighbourhood School) ভর্তি হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার মধ্যদিয়ে জাতীয় সংহতি গঠন, সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হবে বলে রাষ্ট্র সেদিন মনে করছিল।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত এই ধরনের নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও ১৯৯১ সালের আদমসুমারিতে এসে দেখা গেল ১৯৫১ সালের চেয়ে দেশে নিরক্ষর জনসাধারণের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। সেই সময় সারা বিশ্বের নিরক্ষর ব্যক্তির এক তৃতীয় অংশ ছিল আমাদের দেশের জনসাধারণ।

১৯৯০ সারে তাইল্যাণ্ডের জনতেইন শহরে ''সকলের জন্য শিক্ষা" বিষয়ে ১৫০টি দেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। সম্মেলনের ঘোষিত সিদ্ধান্ত ছিল ২১ শতাব্দীর সূচনাতে বিশ্বকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। ১৯৯২ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কনভেনশনে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে

ভারত স্বাক্ষর করে। ঐ কনভেনশনের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল — "State parties recognize the right of the child to education and with a view to achieving this right progressibly, they shall in particular make primary education compulsory and available free to all".

উল্লেখ করা যায় ইতিমধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড চালু করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কতকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যদিও তার ফলগুলি সেদিন আশানুরূপ হয়ে উঠেনি।

শিক্ষার মৌলিক অধিকারের বিষয়টি নিয়ে ১৯৯৩ সালে জে. পি. উন্নিকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মামলায় দেশের সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায় দেয়। ঐ রায়ে বলা হয়েছিল, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে জীবনের অধিকারের অনুকরণে শিক্ষা হবে মৌলিক অধিকার। এই রায়কে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারে নিয়ে আসার জন্য ১৯৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট মুনি রাম সইকিয়া (Muni Ram Saikia)'র নেতৃত্ব একটি কমিটি গঠন। কমিটির সুপারিশ ছিল, ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুর অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকারের জন্য সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। ঐ বছর পার্লামেন্টের বাদল অধিবেশনে ৮৩তম সংবিধান সংশোধনী বিল এনে, শিক্ষাকে সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৫ নম্বর ধারা থেকে সরিয়ে মৌলিক অধিকারের ২১/এ ধারায় যুক্ত করা হয় (এই ধারতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক বলা হয়েছিল)। এই বিলের প্রধান দিকটি ছিল ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের সমস্ত শিশুর শিক্ষাকে ফ্রি ও কম্পালসারি করা। তবে দীর্ঘ টালবাহানার পরে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ধারাগুলি পরিবর্তন করে অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন তৈরি না হওয়ার কারণে তা বলবৎ করা যায়নি। অবশেষে ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে 'Right to Education (RTE) act 2009' কার্যকরী রূপ পায়। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বিনা ব্যয়ে শিক্ষার অধিকার আইনগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে জম্মু-কাশ্মীর বাদে দেশের সর্বত্র এই আইনটি কার্যকরী হয়। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় ছয় বছর পূর্বের শিশুর পড়াশোনা দায়ভার কে নেবে? যদিও তা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবে পালন করবে বলে বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আসে তা হলো শিশুর নিকটবর্তী স্কুল কোনটি হবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিন বলেছিল তা হবে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ হবে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের ক্ষেত্রে হবে ৫০০ মিটারের মধ্যে। উচ্চ প্রাথমিকের জন্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২ কিমি ও শহরের ১ কিমি। আইনে আরো বলা হয়েছিল উপরিউক্ত বয়সের মধ্যে শিশুর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা এলে রাষ্ট্র তা বহন করবে।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে সরকার নিজেই দুই ধরনের নাগরিক তৈরিকে আইনসিদ্ধ করে দেয়। এই আইনটি কেবলমাত্র সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোতে কার্যকরী হবে। কোন বেসরকারি বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনাধীন মডেল স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় বা ঐ ধরনের বিদ্যালয়ে তা কার্যকরী হবে না। কেবলমাত্র তারা ২৫ শতাংশ পর্যন্ত দরিদ্র অংশের ছাত্রদের ভর্তি নিতে পারবে বলে বলা হয়। সুতরাং আইনে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে শিক্ষার বৈষম্যকে আইনগত স্বীকৃতি ও বৈধতা দেওয়া হল।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চেহারাটি বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত করুণ চিত্র দেখা যাবে। যেখানে দেশের জনসংখ্যার নিরিখে শিক্ষার অধিকার চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার অধিকার আইন থাকলেও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী যে স্কুলছুট হচ্ছে, ড্রপআউট ক্রমশ বাড়ছে তা সরকারি পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। ২০১৭-১৮ সালের NSSO-র ৭৫তম সার্ভে রিপোর্টে ধরা পড়েছিল ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সের মোট ৩ কোটি ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই গুরুতর সমস্যাটির কথা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বারে বারে শিক্ষা কমিশনগুলি

তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করলেও সেই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কোন সরকারের পক্ষ থেকে কখনোই নেওয়া হয়নি। মূলত দারিদ্র্যের কারণে যে প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের অধিবেশনে Union Women and Child Development দপ্তরের মন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছিলেন, সারাদেশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩.৭৭ লক্ষ। সহায়িকার সংখ্যা রয়েছে ১১.৬ লক্ষ জন এবং এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৩০.৬২ লক্ষ কেন্দ্রে কোন শৌচালয় নেই, ১.৫৯ লক্ষ কেন্দ্রে কোন পানীয় জলেরও ব্যবস্থা নেই। এই করুণ ভগ্নপ্রায় অবস্থার কোনো রকম পুনর্গঠন না করে সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে আরও ২.৫ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খুলবেন বলেছেন। সরকারি তথ্য পরিসংখ্যানে উল্লিখিত কেন্দ্রগুলির নিদারুণ অবহেলার চিত্রটি সামনে এলেও দায়বদ্ধতার কোনরূপ সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু চলমান প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল বদল করে জাতীয় শিক্ষানীতিতে তিন বছর বয়স থেকে শিক্ষা শুরু হবে বলে বলা হয়েছে। প্রথমে ফাউন্ডেশন স্টেজ ৩-৬ বছর বয়স পর্যন্ত। এই পর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শিশুদের এবং গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে দেখভাল করার জন্য সারাদেশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চালু করা হয়েছিল 'Integrated Child Development Service Program' (ICDS) নামে ১৯৭৫ সালে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো কি অবস্থায় আছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে অথচ এই প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাক্-প্রাথমিকের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল আইন করে। সুতরাং শিক্ষার অধিকার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আর বলে দিতে হয় না। NEP 20-তে কমিশন নিজেই বলেছে "Presently quality Early childhood care and Education (ECCE) is not available to crores of economically disadvantage background". সুতরাং রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল শিশুদের সার্বিকভাবে রক্ষা করা, যাতে তারা সঠিকভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে। সেই অধিকারটি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবে তাদের অধিকারকে হরণ করা হল। চাল-চুলোহীন কেন্দ্রগুলির প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে নিরুপায় অভিভাবকগণ বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন মন্তেশ্বরী, কেজি, বালভাটিকার মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্র অধিকারের কথা বলতে বলতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকুচিত করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি অভিভাবকগণদের আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই যে এই ধরনের পরিকল্পনা এনেছে তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার অধিকার রক্ষা, নৈতিকতা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলবার কথা বলে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে ক্রমশ বেসরকারিকরণ করে দেওয়াই আজকে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন স্বামী বিবেকানন্দ মহিশূরের মহারাজকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং বিনষ্ট প্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।" ভারতী পত্রিকার সম্পাদককে ২৪শে এপ্রিল ১৮৯৭ সালে আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন - "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম" আজকের দিনে শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের এইকথা মনে করে কাজ করতে হবে, তবেই শিক্ষার অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্র গড়ে উঠলে, সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে উঠবে যারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনে যত্নবান হয়ে উঠবেন।

[লেখক অধ্যাপক এবং মানবাধিকার ও শিক্ষাআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা।]

সন্দেশখালির অত্যাচারিত মানুষের পাশে CPDRS

মল্লারিকা কুণ্ডু

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সমস্ত দৈনিক সংবাদ পত্র, সোস্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হৈচৈ শুরু হয়, পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে বসিরহাট মহকুমার সন্ত্রাসের ক্ষেত্র সন্দেশখালির নিরীহ গরীব মানুষ মা-বোনেরা জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কিছু নেতার বাড়ী খামার পুড়িয়ে দিয়েছে, শাসকদলের নেতাদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে রাতের অন্ধকারে শাসকদলের গুণ্ডারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ করেছে এবং গরীব মানুষদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। পুরো এলাকা সন্দেশখালি সহ বিভিন্ন দ্বীপ, জেলিয়াখালি, বেড়মজুর, তুতখালি সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। রেশন দুর্নীতিতে জড়িত শেখ শাহজাহানকে ইডি যায় ধরতে সন্দেশখালিতে। শেখ শাহজাহান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী তৃণমূলের ছত্রছায়ায় ঐ অঞ্চলের বেতাজ বাদশা। তাকে ধরতে গিয়ে কার্যত শাহজাহানের লোকজনের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসে ইডি'র লোকজন। এরপর সন্দেশখালির ত্রাস শাহজাহান গা ঢাকা দেয়। তারপর ১০ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন চ্যানেল সহ সর্বত্র দেখা যায় গরীব অসহায় সাধারণ মানুষ, মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে শাহজাহান সহ তার ডানহাত বামহাত শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার সহ সাঙ্গপাঙ্গদের তাড়া করেছে, তাদের বাড়ী, খামার পুড়িয়ে দিয়েছে। এরপর পুলিশ উত্তম সর্দারকে ধরলেও পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে হয়রানি ধরপাকড় শুরু করে। এলাকার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে। ধামাখালি সহ সমস্ত দ্বীপগুলিতে ও বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্টারনেটে জ্যাম করে দেয়।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এইসব ঘটনা শোনার পর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। আমরা সত্য ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে CPDRS-এর অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথের নেতৃত্বে চঞ্চল ঘোষ ও মল্লারিকা কুণ্ডু সহ তিন সদস্যের তথ্য অনুসন্ধানকারী দল বহু ঘুর পথে সরবেড়িয়া রামপুর বাজার থেকে ফেরি পেরিয়ে জেলিয়াখালি দ্বীপে পৌঁছতে সক্ষম হই। আমরা লক্ষ্য করি বাইরের মানুষের থেকে দ্বীপগুলিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার কাজ প্রশাসন করছে ও তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীও নজরদারি করছে সর্বত্র। সকলের চোখ এড়িয়ে আমরা জেলিয়াখালি দ্বীপে আমাদের পূর্বপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা করি, উনি আমাদের রাস্তাঘাট চিনিয়ে নিয়ে যান ও ঐ দ্বীপের ত্রাস শাহজাহানের ডানহাত বলে পরিচিত শিবু হাজরার বিস্তীর্ণ এলাকা ও তার অত্যাচারের কিছু চিহ্ন ঘুরিয়ে দেখান। আমরা দেখি মানুষের রোষে পুড়ে যাওয়া শিবু হাজরার প্রাসাদোপম বাড়ী, বিস্তীর্ণ খামার, ভেড়ি প্রভৃতি। আর দেখি এগুলি পাহারা দেবার জন্য পুলিশ পোস্টিং আছে। তাদের চোখ এড়িয়ে আমরা গ্রামগুলিতে ঢুকি এবং বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, জানার চেষ্টা করি — সত্য ঘটনা কি? কেন মানুষ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের উপর ক্ষেপে আছে। প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার ঘুরেও মানুষের মুখ খোলাতে পারছিলাম না, কেননা মানুষ এতটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারপর হালদার পাড়া বলে এক জায়গায় আসার পর এক একজন করে মেয়েরা, মায়েরা মুখ ঢেকে তাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বলতে থাকেন। আমরা তাদের মুখের কথা থেকে জানতে পারি শেখ শাহজাহানের ডানহাত শিবু হাজরা দীর্ঘ ১২/১৩ বছর ধরে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করছে। বর্তমান রাজ্য শাসক তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধীদের এদেরই দলের গরীব সাধারণ মানুষের উপর (যারা কিনা তৃণমূল পার্টিরই ভোটার) আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মা-বোনেরা কান্নামিশ্রিত গলায় বলেন — তাদের বাড়ীর পুরুষদের যখন-তখন রাত-বিরেতে জন খাটতে, ভেড়ির জলে কাজ করতে

ডাকত এই দুষ্কৃতিরা। তারপর কাজ করিয়ে টাকা-পয়সা তো দিতই না এমনকি মুখের খাবারটুকুও দিত না। যদি পারিশ্রমিক বা খাবার খাওয়ার টাকা চাইত তাহলে লাঠির বাড়ি পড়ত গরীব মানুষগুলোর উপর। ঐসব দ্বীপগুলিতে বহু গরীব মানুষকে মেরে তারা কর্মহীন করে দেয়। পেটের দায়ে এলাকা থেকে পুরুষরা ভিন্ন জায়গায় কাজ নিয়ে চলে যায়।

মায়েরা আমাদের কাছে প্রমাণস্বরূপ ব্যাঙ্কের বই দেখায়, ১০০ দিনের কাজের নামে কাজ করিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে গরীব মানুষের টাকার বেশিরভাগ শিবু হাজরার লোকজন নিয়ে নিত। আর তাদের ভাগে যৎসামান্য জুটত। অর্থাৎ যদি ৩৫০০ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠত, যার কাজের টাকা সে পেত ৫০০ আর বাকি ৩০০০ টাকা শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের লোকজন নিয়ে নিত। রাত ১২টার পর মা-বোনেদের যাদের বয়স কম তাদের মিটিং আছে বলে শিবু হাজরা তার ডেরায় ডেকে পাঠাত। না গেলে ঘর ভাঙচুর সহ অকথ্য অত্যাচার, এমনকি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীকেও ওরা রেহাই দেয় নি। আবাস যোজনার টাকা ওরা গরীব মানুষের নামে পাশ করিয়ে তাদের দিয়েই ব্যাঙ্কে টাকা ওঠানোর জন্য নিয়ে গিয়ে টাকা তুলে সবটা নিয়ে নিত। মাঝে মাঝে গরীব মানুষগুলোর হাতে সামান্য কিছু টাকা দিত। এমনকি কোন নির্মীয়মান বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে তারপর নিজেদের পকেটে টাকা নিয়ে নেবার ঘটনা আমাদের কাছে একাধিক মানুষ বলেছেন। অনেকে কাগজপত্রও দেখিয়েছেন।

গরীব মানুষ অল্প জমিতে চাষবাস করত তাও এরা বিনা টাকায় কোথাও সামান্য টাকায় দস্তখত করে নিয়ে নিয়েছে, এইভাবে দুষ্কৃতিকারীরা বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছে। মা-বোনেরা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ঐসব জমি আমাদের দেখিয়েছেন যা এখন শিবু হাজরা, শাহজাহানদের দখলে। যারা জমি দিতে চায় নি তাদের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দখল করে নিয়েছে এসব তথ্য এলাকার গরীব মানুষ কাঁদতে কাঁদতে আমাদের তথ্য অনুসন্ধাকারী দলের কাছে তুলে ধরেন। আরও বলেন তৃণমূল সরকার আসার পরেও ভোট অনেকবার এসেছে কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকায় কেউ ভোট দিতে যেতে পারত না। তাদের ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য পরিচয়পত্র ওরা জোর করে আগেই নিয়ে নিত আর বলত — যা তোদের ভোট হয়ে গেছে। যদি কেউ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিত তাকে ওদের সামনে দেখিয়ে ভোট দিতে হত। অথচ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ই শাসকদলের লোক।

এরপর এলাকার মানুষই অন্ধকার নামার আগে আমাদের এলাকা থেকে বার করে টোটো করে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলে দেয় যাতে আমরা নিরাপদে ফিরতে পারি।

CPDRS-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। CPDRS সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন — যেমন নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ, লিগাল সার্ভিস সেন্টার, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, PCAI প্রভৃতি সংগঠন মিলিতভাবে সন্দেশখালি, জেলিয়াখালি সহ সমস্ত দ্বীপগুলিতে অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ রাণুছায়া মঞ্চে এক ধিক্কার সভার আয়োজন করে। বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন, রিদ্ধি সেন, সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, অর্ক ভাদুড়ী, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার সহ বহু ডাক্তার, আইনজীবী, নাট্যব্যক্তিত্ব সহ সমাজের বিভিন্ন ধারার মানুষজন। সভা যত এগিয়েছে মানুষের ভিড়ও বেড়েছে, উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রথমেই CPDRS-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দলের পক্ষ থেকে আইনজীবী ও অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ সন্দেশখালি, জেলিয়াখালির ঘটনা যা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। গোটা সভা নির্বাক হয়ে অত্যাচারের কাহিনী শোনেন ও বর্তমানে সরকারের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে থাকেন।

অধ্যাপক সুজাত ভদ্র ঐ সভা থেকে প্রস্তাব তোলেন সন্দেশখালি নিয়ে গণশুনানি হোক। সভায় উপস্থিত সকলেই তা সমর্থন করেন। তিনি নিজেও ওখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুজাতবাবু বলেন, বর্তমানে তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আইন থাকা সত্ত্বেও

আইনের রক্ষকরা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের প্রতিকার করে না। অত্যাচারী মানুষ ক্ষেপে গেলে উল্টে তাদেরই শাসন করে জেলে পুরে রাখে আর সত্যিকারের অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন বলেন, এই প্রতিবাদ সভা সময়োচিত। যারা অত্যাচারী আর অত্যাচারিত উভয়ই তৃণমূল। তাহলে দলটি কেমন? আজ নিরীহ গরীব মানুষের উপর সকল সন্ত্রাসীদের অত্যাচার। আমি কোন দল করিনা। তবুও বলব যারা নিজেদের নিচুতলার মানুষের উপর অত্যাচার করে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন বেশ কিছুজন নাকি-কান্না করছেন আমরা বুদ্ধিজীবীরা নাকি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় যেরকম ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন সেভাবে নেই। তাদের আমি বলছি, যারা এখানে এসেছেন থিয়েটারের লোক আর যারা আসতে পারেননি কোনো শো পড়ে যাওয়ায় আমরা সকলেই অত্যাচারিত গরীব মানুষের পক্ষে আছি, থাকব। কোন সরকারের রঙ দেখি না আমরা, যেখানে মানুষ নিপীড়িত হবে সেখানে আমরা মানুষের পক্ষে আছি। যারা নাকি-কান্না করছেন তা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এটা আপনাদের বুঝতে হবে।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, শাসকরা বিরোধীদের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে আর বিরোধীরা শাসকের ত্রুটি ধরে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, শুধু এটাই চলতে থাকবে নাকি জনস্বার্থের কথা দলগুলি ভাববে, যারা অত্যাচারিত তাদের পাশে থাকবে! তিনি প্রশ্ন করেন, একজন মহিলা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কি আদৌ অত্যাচারিত নারীদের পাশে দাঁড়াবেন? যদি না দাঁড়ান সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মা-বোনেদের সাহস যোগাতে হবে। পুলিশ আইনের রক্ষক হয়েও যেভাবে দুষ্কৃতিদের পাহারা দিচ্ছে আর গরীব মানুষকে অত্যাচার করছে বা করে আসছে তা সত্যিই আজ আমাদের ভাবাচ্ছে, আমরা কোন সমাজে বাস করছি।

অভিনেতা রিদ্ধি সেন বলেন, বহু অনুষ্ঠানে উদ্বোধনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, অথচ আজও সন্দেশখালিতে যেতে পারলেন না। উনি বলেন, আজ যুবসমাজকে বুঝে নিতে হবে বর্তমান শাসক পূর্বের শাসকের ন্যায় মানুষকে অমানুষ করার চক্রান্তে নেমেছে। দুষ্কৃতিদের যদি সময় মত সাজা দিত বা ভোটের লাভ লোকসান না দেখে সাধারণ মানুষের পাশে থাকত তাহলে গরীব মানুষ তাদের পাশেই থাকত। শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের পাশে আছি বললেই সবাই মেনে নেবে না, সাধারণ মানুষকে অত বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।

প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, আমরা সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ছিলাম। আপনারা জানেন, অত্যাচার শেষ কথা বলে না। আমরা সে সময় নন্দীগ্রামে গেছি, সিঙ্গুরে গেছি, দেখেছি ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে মানুষ মনে না করার অবস্থা। তাতে যে মানুষ একত্রিত হয়েছিল যাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সরকারে বসেছে তারাই আজকে ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে মানুষ মনে করছে না। আমরা তখনও যেমন সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম এখনও থাকব। বুদ্ধিজীবীরা কোথায় — এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আমাদের প্রতিবাদকে আটকানো যাবে না।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী বলেন, সারা পৃথিবীতেই কোথাও অত্যাচার শেষ কথা বলেনি এখানেও বলবেনা। পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ একত্রিত হচ্ছে তেমনি বিশ্বের সর্বত্রই একই চিত্র। অত্যাচারিত মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে ফেটে পড়ে। সন্দেশখালিতেও গরীব মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে তাই তারা হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, একে আমরা সম্মান করি।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া একইভাবে অত্যাচারীদের ধিকৃত করেন, গরীব জনতার পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করেন ও সভাস্থলে তাঁর এই বিষয়ের উপর একটি কবিতা পাঠ করেন।

এরপর আরও বিশিষ্ট মানুষ বক্তব্য রাখেন সকলেই সন্দেশখালির মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন। সভার সঞ্চালক, CPDRS-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক সভা শেষে বলেন, ‘সন্দেশখালি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে প্রান্তে এমন সন্ত্রস্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে। পূর্বে উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ, সর্বত্রই একই রকম সন্ত্রাস আমরা দেখেছি। শাসক বদলালেও, শাসকের চরিত্র বদলায় না।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মন্তব্য অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। সন্দেশখালিতে শুধু হিন্দু মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে, তাঁর এই মন্তব্য তাদের নিকৃষ্ট রাজনীতিকেই বেআব্রু করে। অত্যাচারিত মানুষের পাশে থাকা নয়, ভোটের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। মনে রাখা দরকার, অত্যাচারীর কোনও জাত হয় না। অত্যাচারিত মানুষেরও কোনও জাত হয় না।"

এই সভা থেকেই স্থির হয় সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন সহ এক প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি যাবেন, অত্যাচারিতদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের পাশে থাকার বার্তা দেবেন। উপস্থিত সকলেই শেখ শাজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার সহ সকল দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি করেন ও সন্ত্রস্ত সন্দেশখালিতে শান্তি ফেরানোর আর্জি জানান।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে ১৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল রবীন্দ্রসদন থেকে সায়েন্সসিটি হয়ে ধামাখালিতে গাড়ী রেখে নৌকায় নদী পেরিয়ে তারপর টোটোয় করে প্রথমে জেলিয়াখালি, তারপর আরও একটা নদী পেরিয়ে সন্দেশখালি, তারপর আবার ফেরী পারপার করে তুতখালি, বেড়মজুর হয়ে একাধিক দ্বীপ পরিদর্শন করেন। এই টিমে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া সহ নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত, সিপিডিআরএস-এর কার্য্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন, সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সঙ্গীতশিল্পী কুমকুম সরকার, আইনজীবী লীলাময় রায়, ডাক্তার নীলরতন নাইয়া, সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের আমিনুদ্দীন শেখ প্রমুখ।

পুলিশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে জেলিয়াখালিতে গিয়ে দেখা যায় মা-বোনেরা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলবেন বলে স্কুল মাঠে জড়ো হতে থাকেন। সকলেই তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনেকে তাঁদের আবাস যোজনার টাকার ব্যাঙ্কের বই, কোন বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আর নিজেদের সত্যিকারের ঝুপড়ি বাড়ী দেখায়।

কিভাবে গরীব মানুষের টাকা দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা ছবি তুলিয়ে নিয়ে নিয়েছেন। মা-বোনেরা যারা রাতের অন্ধকারে যেতে চায়নি ওদের কাছে, তাদের উপর যে মারধোর হয় তার চিহ্ন আমাদের অনেকেই দেখিয়েছেন। তাদের যে মারধোর করা হত পুরুষরাও তার চিহ্ন, হসপিটালের কাগজ দেখান, প্রতিনিধি দলে ডাক্তার থাকায় তাদের এগুলি দেখাতে সুবিধা হয়েছে।

তারপর প্রতিনিধি দল একে একে সন্দেশখালি ও অন্যান্য দ্বীপে যায়। সর্বত্রই মানুষ যে সন্ত্রস্ত তা বোঝা যাচ্ছিল। উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ শুনলেও মানুষজনের আর্থিক অবস্থা যে খুব খারাপ তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশিরভাগই ঝুপড়ি বাড়ী আর মাঝে মাঝে প্রাসাদোপম বাড়ী। 'প্রাসাদ'গুলি শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের। চাষের জমি সব ভেড়ি হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ বিশেষ করে পুরুষরা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক।

এরপর আবার নদী পেরিয়ে ধামাখালিতে এসে গাড়ী করে বেড়মজুর যাওয়া হয়। এখানে পুলিশ-প্রশাসন ব্যারিকেড করে রেখেছে এলাকা। ১৪৪ ধারার জারির নির্দেশের প্রতিলিপি দেখিয়ে প্রশাসন প্রতিনিধি দলকে ঢুকতে দেন না। ওখান থেকে ফিরে এসে সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া একটা গানের ভিডিও প্রকাশ করেন যেখানে অত্যাচারিতদের বেশ কিছু দৃশ্য দেখান হয় এবং সন্দেশখালির মানুষের হয়ে গান বাঁধেন যা অত্যাচারিত মানুষের লড়াইয়ে প্রেরণা জোগায়।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সদস্য হিসাবে গরীব মানুষদের অধিকার রক্ষার লড়াইতে পাশে থাকবো ও সন্দেশখালি সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করবো, এই আমাদের অঙ্গীকার।

[লেখিকা মানবাধিকার কর্মী]

সাম্প্রতিক সময়ে সিপিডিআরএসের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাকের বিবৃতি সমূহ

পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে হিন্দুত্ববাদীদের হামলার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি (২৬.০১.২০২৪)

"গত ২৩ জানুয়ারি পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে (ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, FTII) এ বি ভি পি -র লোকজন হামলা চালায়। নির্বাচিত ছাত্র সংসদের সভাপতি সহ পড়ুয়াদের মারধর করে। "বাবরি ফিরে দেখা : সংবিধানের মৃত্যু" শীর্ষক ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। "রাম কে নাম" চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের ঘরেও হামলা চালানো হয়। বহু দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র নষ্ট করা হয়। ২১ জানুয়ারিও এই বাহিনী ইনস্টিটিউটের গেটে জয় শ্রীরাম শ্লোগান দিয়ে হল্লা করে। এই ঘটনা হিটলারের গেষ্টাপো বাহিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা মনে করি, রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় মদতে দেশজুড়ে যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ঘটনা তারই ফলশ্রুতি। স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার ভারতবর্ষে আজ ভূলুণ্ঠিত।

পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, সর্বস্তরের নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।"

দিল্লিতে ৬০০ বছরের একটি পুরনো মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি (৮.০২.২০২৪)

"দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি মেহরোলি এলাকায় অবস্থিত ৬০০ বছরের পুরনো আখুন্দজি মসজিদটি গত ৩০ জানুয়ারি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। এত পুরনো মসজিদ কেন ভেঙে ফেলা হল, সে বিষয়ে দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটির কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। শুধু তাই নয়, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার পড়ুয়াদের জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

ধ্বংস করে দেওয়া বাবরি মসজিদের স্থানে অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মান্ধ উন্মত্ত বিজেপি আরএসএস সমর্থকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর একতরফা আক্রমণ চালিয়েছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার দিল্লিতে মসজিদ ভেঙে ফেলা, উত্তরপ্রদেশের জ্ঞানবাপী মসজিদ সংলগ্ন বিতর্কিত এলাকায় বারাণসী আদালতের পুজোর অনুমতি দেওয়া, দেশের সমস্ত মসজিদের নিচেই মন্দির আছে বলে সব মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার হিন্দুত্ববাদীদের দাবি সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে, দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এই ঘটনায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনের কাছে দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালনের দাবি জানাই। পাশাপাশি, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে, দেশের অভ্যন্তরে সুস্থ পরিবেশ ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানাই।"

কলকাতা বইমেলায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশি হামলার নিন্দা করে বিবৃতি (৩০.০১.২০২৪)

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী ছিল, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষেও এই দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। অথচ এই দাবী গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তুলে ধরার অপরাধেই কলকাতা বইমেলাতে একদল পড়ুয়াকে পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে মেলার

বাইরে বের করে দেয়, থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে।

প্যালেস্টাইনের গণহত্যা বন্ধ করার দাবী, কোন অন্যায় দাবী নয়। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং মুক্ত প্যালেস্টাইনের পক্ষে লেখা পোস্টার ছিঁড়ে দেয় হিন্দুত্ববাদীরা অথচ পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় না।

বই মুক্ত চিন্তার পরিসর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অথচ বইমেলাতে সেই মুক্তচিন্তার প্রকাশকে স্তব্ধ করে দিতে চায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। কলকাতা বইমেলাতে এমন ঘটনা নতুন নয়। তসলিমা নাসরিনের বই প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া, লিটল ম্যাগাজিন বিক্রি করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ফিরে দেখলে বোঝা যায়, শাসক পরিবর্তন হলেও সন্ত্রাসের রূপ পরিবর্তন হয় না।

কলকাতা বইমেলা বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধের সাক্ষী, বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধের সাহিত্যের মিলনক্ষেত্র বইমেলার লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন। আজ যখন সারা দেশ জুড়ে বিরুদ্ধতা স্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় আয়োজন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে, সে সময় কলকাতা বইমেলার নিন্দাজনক ঘটনা বাংলার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে এ বছর কলকাতা বইমেলাতে পুলিশ-প্রশাসনের, বইমেলা কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি, আমরা মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকার এবং মুক্তচিন্তার পরিসর রক্ষা করতে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে, সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।”

জয়নগরে কীর্তনীয়া দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-এর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি (১২.০২.২০২৪)

“দীনকৃষ্ণ ঠাকুর একজন বিশিষ্ট কীর্তনীয়া। উনি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, মানবতার প্রসারে কীর্তনকে ব্যবহার করতেন। তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে কারো বিরোধিতা থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে কেউ গায়ের জোরে আটকাতে পারে না। আমরা দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের উপরে দৈহিক নিগ্রহের তীব্র নিন্দা জানাই। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নজরুল, নেতাজীর বাংলায় এধরনের ঘটনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের উপরে দৈহিক নিগ্রহ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের উৎকট প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষেই আজ অত্যন্ত প্রকট।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে, বিশিষ্ট কীর্তনীয়া দীনকৃষ্ণ ঠাকুরের উপর হামলায় জড়িত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার এবং সমস্ত মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাশাসনকে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।”

সম্প্রতি কৃষক আন্দোলনের উপর লাঠিচার্জ ও ড্রোনের মাধ্যমে টিয়ার গ্যাস ছড়ানোর প্রতিবাদে বিবৃতি (১৭.০২.২০২৪)

“রাজধানী নিউ দিল্লীর বুকে ইতিপূর্বে কৃষক আন্দোলনের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বর্বরোচিত নিপীড়নে সাড়ে সাতশো আন্দোলনকারী শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। আন্দোলনের চাপে, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার সেদিন পিছু হটেছিল, কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় কৃষকরা আবার পথে নেমেছেন। এই কৃষক আন্দোলনের উপর আবারও নেমে এসেছে নির্মম লাঠিচার্জ, ড্রোনের মাধ্যমে টিয়ার গ্যাস সহ বর্বর রাষ্ট্রীয় আক্রমণ। যেভাবে আন্দোলনের গতিরোধ করতে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে কাঁটাতার দিয়ে, রাস্তায় বর্শা পুঁতে দিয়ে, তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বে-নজীর এবং সভ্য সমাজের পক্ষে লজ্জার। যেন রাষ্ট্র কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সাংবিধানিক আইন-কানুন ও মানবাধিকারকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেভাবে বর্বরোচিত কায়দায় নাগরিকদের নিরস্ত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাষ্ট্র দমন করতে চাইছে, তা প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণ। বিরোধী কণ্ঠস্বর নির্মূলের এই ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় অভিযান স্মরণ

করিয়ে দেয় জার্মানীর হিটলারতন্ত্রকে। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে, কৃষকদের এই আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশোধিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ২০২০ (section-3– sub-section 1(A)) অনুসারে খাদ্যশষ্য মজুতের উর্দ্ধসীমা কার্যত উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অত্যবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে খাদ্যশষ্য, দানাশষ্য, ডাল, ভোজ্য তেল , তৈলবীজ, আলু ও পেঁয়াজের মত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যকে। কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, স্বল্পসুদে কৃষিঋণ সহ কৃষকদের দাবীগুলোর সাথে সংঘাত বেঁধেছে করপোরেট স্বার্থের। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে খাদ্যের সীমাহীন মজুতদারী, কালোবাজারী, মূল্যবৃদ্ধি সহ কি ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ নিয়ে হাজির হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার জন্য, ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনে আমরা সংহতি জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার ধ্বংসকারী রাষ্ট্রীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণকে সামিল হবার আহবান জানাচ্ছি।"

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ অনুদানপ্রাপ্ত সমস্ত নাট্যদলকে একটি বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ করার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে বিবৃতি (১৮.০২.২০২৪)

"সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের অনুদান-প্রাপ্ত নাট্যদলগুলোর কাছে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে দেশের সমস্ত রাজ্যে একটি নির্দেশিকা এসেছে। সঙ্গে ছ'পাতার একটি ছোট নাটক, যার নাম "লে আও ওয়াপস সোনে কি চিরিয়া"। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সমস্ত নাট্য দলকে একুশে ফেব্রুয়ারি এই নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে এবং তা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার পোর্টালে আপলোড করতে হবে। নির্দেশ না মানলে অনুদান বন্ধ করার ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই নাটকে কেন্দ্র সরকারের গুণকীর্তনের মুদ্রা স্পষ্ট। যেমন, করোনাকালে ভারত সরকার কিভাবে মুফতে দেশে দেশে টিকা পাঠিয়েছে তার প্রচার, কেন্দ্র সরকারের "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" এই বহু প্রচারিত ঢক্কানিনাদ, ভারতের "বিশ্বগুরু" হয়ে ওঠার রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিপূর্ণ এই নাটকের সংলাপ। সংলাপে উল্লিখিত হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে দেশের পুরাণ, বেদ ইত্যাদির সমন্বয়ের কথা। সাড়ম্বরে ঘোষিত হয়েছে, আরএসএসের অনৈতিহাসিক দাবী, বিশ্বের যা কিছু আবিষ্কার, সবের শিকড় এদেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই, সবই বেদে আছে। ফলে ফিরে যেতে হবে সেই পুরাণের যুগে, মুনি ঋষিদের যুগে।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস মনে করি, সরকারি অনুদান দয়ার দান নয়। তাই অনুদানপ্রাপ্ত নাট্য দলকে বিশেষ নাটক, বিশেষ মত প্রচার করার জন্য বাধ্য করা, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার তথা মানবাধিকারের ধারণার পরিপন্থী। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশিকার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাট্যদলগুলি তথা সাধারণ মানুষের কাছে, এই অগণতান্ত্রিক নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।"

রিপাবলিক বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক সন্তু পান'কে গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে বিবৃতি (২০.০২.২০২৪)

"সন্দেশখালিতে কর্তব্যরত অবস্থায় সাংবাদিক সন্তু পান'কে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে পুলিশের গাড়ীতে তোলা হয়েছে, আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে, এই ঘটনায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই বেআইনি কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদেরও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার হওয়া উচিত।

রিপাবলিক বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকতার নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, সমালোচনা আছে কিন্তু এ সমালোচনার যথার্থতা ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার স্বীকৃতি দেয় না। কিছুদিন আগে খড়্গপুরের সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, শাসকদলের অপছন্দের খবর করার অপরাধে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রোষানলে পড়ে আক্রান্ত সাংবাদিকদের তালিকা করলে, তা মহাকাব্য হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায়, আমরা সাংবাদিক সন্তু পান'কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানাই এবং পাশাপাশি, এরাজ্য তথা সারা দেশজুড়ে সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদ জানাই।"

সম্প্রতি কৃষকদের উপর নৃশংস আক্রমণে কৃষক মৃত্যু এবং সমাজমাধ্যম ব্যবহারে বাধা দেওয়ার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি (২৩.০১.২০২৪)

"খনৌরি সীমান্তে হরিয়ানার বিজেপি সরকার পাঞ্জাবের ভাতিন্দার বাসিন্দা আন্দোলনকারী যুবক, কৃষক শুভ করন সিং কে হত্যা করেছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর সমস্ত রকম নিষ্ঠুর দমন মূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। কৃষক আন্দোলন দমন করতে যুদ্ধের সময় ব্যবহার্য ড্রোনের সাহায্যে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটানো হয়েছে। কাশ্মীর সীমান্তে ব্যবহার্য গুলি, বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে শাসক বিজেপি সরকার যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলনে সংহতি জ্ঞাপন করছি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারত সরকার সমাজ মাধ্যমের কিছু নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও পোস্টকে ব্লক করবার নির্দেশ জারি করেছে। সরকার কর্তৃক কোন কোন স্থানে ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণার পরিপন্থী। সংবিধানের ১৯(১)(এ) এবং ১৯(১)(জি)ধারা অনুযায়ী ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো পেশার চর্চা ও বক্তব্য রাখার স্বাধীনতার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণায় রয়েছে। মতামত প্রকাশ ও বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা নাগরিকদের মৌলিক ও সার্বজনীন অধিকার। এছাড়াও আমাদের দেশের সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েতের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ভিন্নমত পোষন করা এবং বিনা বাধায় দেশের যেকোন প্রান্তে যাওয়ার অধিকারও সংবিধান নাগরিকদের দিয়েছে। আমরা মনে করি, প্রতিবাদী কৃষকদের ট্রাক্টরসহ যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছে। হাইকোর্ট হরিয়ানা সরকারের কৃষকদের ট্রাক্টরসহ যাওয়ার কর্মসূচি বাধা দেওয়াকে তিরস্কার করেছে।

এই পরিস্থিতিতে সিপিডিআরএস দাবি করছে

- ❑ কৃষকদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করতে দিতে হবে
- ❑ পাঞ্জাব, হরিয়ানা অথবা জম্মু ও কাশ্মীর যেখানেই হোক না কেন কৃষকদের বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রাণনাশক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করতে হবে
- ❑ নিহতের পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
- ❑ কৃষকের মৃত্যুর জন্য দায়ী আধিকারিকদের অবিলম্বে বরখাস্ত এবং গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে
- ❑ পুলিশি আক্রমণে আহত কৃষকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে।

এবিপি আনন্দের সাংবাদিক প্রকাশ সিনহার বাড়িতে পুলিশী তল্লাশির প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি (০১.০৩.২০২৪)

"সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সমস্ত শাসকই কার্যক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও সাংবাদিকদের হেনস্থা ও নিগ্রহ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সাংবাদিক প্রকাশ সিনহার বাড়িতে ভোর বেলায় তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো নোটিশ ছাড়াই পুলিশের তল্লাশি, এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

তল্লাশির পর পুলিশ প্রকাশ সিনহার বাড়ি থেকে কিছু না পেয়ে পেন ড্রাইভ ও ল্যাপটপের 'ডেটা ট্রান্সফার' করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনা সংবিধানপ্রদত্ত নাগরিকের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। সুপ্রিম কোর্ট বহু জাজমেন্টে এই অধিকার রক্ষার কথা বারবার উল্লেখ করেছে।

সম্প্রতি সন্দেশখালিতে কর্তব্যরত অবস্থায় এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিছুদিন আগে শাসকবিরোধী খবর করার অপরাধে খড়্গপুরেও এক সাংবাদিক গ্রেফতার হন। প্রকৃতপক্ষে, অপছন্দের

সংবাদমাধ্যম তথা সাংবাদিকে বশে রাখতে হিংস্রতার পথ নেওয়া, এক মারাত্মক প্রবণতা।

আমরা সিপিডিআরএস সংগঠন, মানবাধিকার বিরোধী এই ধ্বংসাত্বক প্রবণতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংবাদিক হেনস্থায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবি জানাই।”

সম্প্রতি উত্তরাখন্ডের নৈনিতাল জেলার হলদওয়ানির নৃশংসতার নিন্দা করে বিবৃতি (২২.০২.২০২৪)

‘‘গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ হলদওয়ানির স্থানীয় প্রশাসন অভিযান চালিয়ে একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসা ধ্বংস করে। ঘটনাটি স্পষ্টতই ধর্মীয় ক্ষোভ ও উন্মাদনাকে উস্কে দেয়। ঘটনাটির বিরুদ্ধে জনগণ যখন প্রতিবাদ ধ্বনিত করছিল তখন প্রশাসন তদন্তের নামে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও অত্যাচার চালায়। আইনশৃঙ্খলার নামে পুলিশ গুলি চালালে ঘটনা স্থলে ৫ জন প্রতিবাদী নিহত হয়।

শুধু তাই নয়, এই ঘটনার রেশ ধরে স্থানীয় প্রশাসন সমগ্র মুসলিম জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কারফিউ জারি করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

একটি স্বাধীন দেশে এই ঘটনাগুলি নাগরিকদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, প্রশাসনকে অযৌক্তিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কে দিয়েছে? কর্তৃপক্ষ লিখিত বা মৌখিক নোটিশ ঘোষণা না করে এই ধরনের ধ্বংসলীলা চালাতে পারে কিনা ? প্রশাসন কি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার জন্য এই নির্দেশ দিয়েছিল? প্রশাসন নাগরিকদের প্রতি এমন প্রতিহিংসা নিতে পারে কি ?

শুধু উত্তরাখণ্ড নয়, সমগ্র দেশে নাগরিকদের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, প্রশাসনের এটি নিছক ভুল করে করা ঘটনা নয়। নাগরিকদের ঐক্যকে বিভক্ত করার জন্য সাজানো পরিকল্পনা।

এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে সিপিডিআরএস দাবি করে -

(১) প্রশাসনের সন্দেহজনক ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বা অন্তত হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে এই ধরনের ঘটনাগুলির তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

(২) ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

(৩) ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৪) ভেঙে ফেলা কাঠামো পুনরায় নির্মাণ করতে হবে।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, নাগরিকদের কাছে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে, ধর্ম নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার দাবিতে এবং বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

সিএএ-এর ফলে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে টালিগঞ্জের বাসিন্দা এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে বিবৃতি (২২.০৩.২০২৪)

‘‘বিজেপি সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার সময় থেকেই ভারতবর্ষের অসংখ্য নাগরিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। দেশজুড়ে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই আমাদের আশঙ্কা ছিল, এই ঘোষণায় জনমানসে প্রবল আতঙ্ক তৈরি হবে। সেই আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে সিএএ-এর ফলে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কই এক তরতাজা যুবকের প্রাণ কেড়ে নিল বলে পরিবারের অভিযোগ। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।

নিঃশর্ত নাগরিকত্বের ন্যায়সঙ্গত দাবি, উদ্বাস্তু আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি। একে অস্বীকার করে

বিজেপি জনসাধারণের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে হীন ভোট রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের আইন এনেছে। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে শর্তাবলী তারা আরোপ করেছে, যা পূরণ করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব প্রায়। ফলে দীর্ঘ বছর বংশানুক্রমে এদেশে বসবাস করার পরেও বেনাগরিক হওয়ার আশঙ্কা এবং আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়াবহ চিত্র এ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই উদ্বেগ ও আতঙ্ক আরো অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। তাই আমরা অবিলম্বে অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লংঘনকারী সিএএ বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।"

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা প্রসঙ্গে বিবৃতি (১১.০৩.২০২৪)

"ভারতবর্ষের জনমতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই অগণতান্ত্রিক আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানাই।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বিজেপি-আরএসএস উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলে ভোটের রাজনীতি করে চলেছে। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সিএএ কার্যকর করার জন্য এই সময় বেছে নেওয়া থেকেই পরিষ্কার, বিজেপি-আরএসএসের একমাত্র লক্ষ্য ভোট। আমরা মনে করি, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন গণতন্ত্রকে প্রতিফলিত করে না। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির এ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।"

দিল্লিতে নামাজিদের ওপর পুলিশি বর্বরতার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি (১১.০৩.২০২৪)

"উত্তর দিল্লির ইন্দোরলোক এলাকায় নামাজ আদায়ের সময় দিল্লি পুলিশের এক ইন্সপেক্টর নামাজিদের বুটের লাথি মারেন। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

লাথি মারার অজুহাত হিসেবে রাস্তায় নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, রাস্তা আটকে যেকোনো ধর্মাচরণ, সে নামাজ হোক কিংবা দুর্গা পূজো, কালি পূজো, যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে, তা প্রতিকার করার সুনির্দিষ্ট আইনী ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এজন্য কোনো পুলিশ অফিসারের কাউকে লাথি মারার অধিকার জন্মায় না।

একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনায় দেখা গেছে, তা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজ্জনক। বিজেপি আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার, সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এই ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করছে। দিল্লী পুলিশের বর্বর আচরণে এই ঘৃণাই প্রতিফলিত হয়েছে। যা ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা স্বরূপ।

জনমতের প্রবল চাপে সেই অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর কোথাও যেন না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার উপযুক্ত বিচার ও দোষী পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।"

লাদাখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিবৃতি (২৬.০৩.২০২৪)

"পার্লামেন্টে সংগরিষ্ঠতার জোরে অগণতান্ত্রিকভাবে ৩৭০ ধারা বাতিলের ধারাবাহিকতাতেই জম্মু-কাশ্মীরকে দ্বিখন্ডিত করে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে কেন্দ্র সরকার। লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের রক্ষাকবচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই উনিশের লোকসভা ভোট এবং কুড়ির পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ভোটে জেতে। দীর্ঘ টালবাহানার পর বিজেপি সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল হবে না।

লাদাখে এখন না আছে স্থানীয়দের জন্য সংরক্ষণ, না আছে গণতান্ত্রিক কাঠামো। এখানে বিধানসভা নেই, নির্বাচিত নেতা নেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি আমলাতান্ত্রিক শাসন চলছে। আর এই শাসনে কর্পোরেট পুঁজির অবাধে চলছে জমি দখল ও

বেপরোয়া খননকার্য, যা লাদাখের বাস্তুতন্ত্র, জাতিগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। লাদাখবাসীর প্রশ্ন, পাহাড়গুলোকে বিভিন্ন কর্পোরেট শিল্প সংস্থা আর খনি সংস্থার কাছে বেচে দেওয়াটাই লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার আসল উদ্দেশ্য নয় তো?

ক্ষুব্ধ লাদাখবাসীর আন্দোলন তীব্র হয়েছে ম্যাগসাইসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক এর আমরণ অনশন শুরু হওয়ার পর। খোলা আকাশের নীচে মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের হাড়জমানো শীতে তিনি রাত কাটাচ্ছেন। আমাদের আশংকা যে কোন মূহূর্তে এই বৃদ্ধ মানুষটির জীবন সংশয় হতে পারে।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস লাদাখবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাই এবং লাদাখের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ন্যক্কারজনক প্রতারণার তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি, এ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে লাদাখবাসীর ন্যায়সঙ্গত এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানাই।"

দেশের সৈনিক স্কুলগুলিকে আরএসএস বিজেপির হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে বিবৃতি (০৬.০৪.২০২৪)

"২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পিপিপি মডেলের নামে ভারতের সৈনিক স্কুলগুলি চালানোর জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর দরজা খুলে দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে, দেশের ৪০টি সৈনিক স্কুলের অধিকাংশই আরএসএস বিজেপি এবং তার রাজনৈতিক শাখা সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে স্কুলগুলির ফি বেড়েছে বিপুল পরিমাণে, পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় অন্ধতার চর্চার অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

সৈনিক স্কুল থেকে পড়াশুনো আর ডিসিপ্লিন শিখে ছেলেমেয়েরা যোগ দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। ধর্ম বর্ণ জাতির উর্ধে উঠে দেশবাসীকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়েই তারা পেশায় প্রবেশ করে। অথচ বিজেপি আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করার কাজ করে চলেছে। সৈনিক স্কুলগুলোকে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে তুলে দেওয়া, তারই অঙ্গ।

এর ফলে সমগ্র দেশবাসীর প্রতি সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট হয়ে যাবে। আরএসএসের দেশপ্রেমের ধারণা, বীর বিপ্লবী নেতাজি, ভগৎ সিং-দের মহৎ চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে আরএসএসের চিন্তায় শিক্ষিত এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতের সৈনিক হিসেবে দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে, জনস্বার্থে গড়ে ওঠা আন্দোলন ভাঙার হাতিয়ারে পরিণত হবে।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস সৈনিক স্কুলগুলোকে বিজেপি আরএসএস এর হাতে তুলে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।"

ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের বিরোধিতা করে বিবৃতি (১৬.০৪.২০২৪)

"সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক "বোলতা হিন্দুস্তান" ও "ন্যাশনাল দস্তক" নামের দুটি ইউটিউব চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ফতোয়া জারি করে সংবাদ মাধ্যমের গলাটিপে ধরার ফ্যাসিষ্ট আচরণ, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরিপন্থী। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস কেন্দ্রীয় সরকারের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং বন্ধ করে দেওয়া চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার চালু করার দাবি জানাই।

উপরোক্ত ইউটিউব চ্যানেলগুলো কেন্দ্র সরকারের পক্ষে কথা বলত না। স্বাধীন মত প্রকাশ করত। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে ইভিএম এর সাথে ভিভিপ্যাট মিলিয়ে দেখার বিষয়ে যে মামলা চলছে, সে বিষয়ে এরা সংবাদ পরিবেশন করছিল, যা সরকারের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করছিল না, এটাই তাদের অপরাধ। এজন্যই এদের সরকারি রোষানলে পড়তে হয়।

মোদী সরকারের আমলে সারাদেশে স্বাধীন মত প্রকাশের পরিসর ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে বারবার, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা, মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার রক্ষার

স্বার্থে সর্বস্তরের সাংবাদিক ও জনসাধারণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।”

ছত্তিসগড়ে এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতি (১৮.০৪.২০২৪)

‘‘ছত্তিসগড়ে মাওবাদী দমনের নামে একের পর এক ‘‘এনকাউন্টার” ঘটানো হচ্ছে। গত পরশু আবার ২৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে ছত্তিসগড়ে এ পর্যন্ত ৬৮ জন মানুষকে হত্যা করা হল। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর পক্ষ থেকে এই গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষে ‘‘এনকাউন্টার” শব্দটা ব্যবহার হতে থাকে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শহরের মাফিয়াদের খতম করার জন্য মুম্বই পুলিশ এনকাউন্টার হত্যা শুরু করে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হলে যে মৃত্যু হয়, তাকেই এনকাউন্টার বলে। বাস্তবে আত্মরক্ষার অজুহাতে সাজানো (ফেক) এনকাউন্টারে খুন করাটা পুলিশের অধিকারে পরিণত হতে থাকে। কংগ্রেস আমলে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশ এর সাক্ষী।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকায় এনকাউন্টার নিষিদ্ধ। এনকাউন্টার হলে যে বাহিনী এনকাউন্টার করলো, আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হবে। তারপর তাদের কোর্টে প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা নির্দোষ। প্রমাণ করতে হবে সেটা সত্যিই এনকাউন্টার। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনকাউন্টারের পর কোন কেসই ফাইল হয় না। আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই ভুয়ো এনকাউন্টারে বিরোধীদের মেরে দেওয়া, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এ ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। শুধু ছত্তিশগড় নয়, উত্তরপ্রদেশে বিগত ৬ বছরে ৯৪৩৪টা এনকাউন্টার হয়েছে। দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শংকর এর ভাষায়, সন্ত্রাসীরা নিয়ম মানে না, তাই তাদের হত্যা করার ক্ষেত্রে নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছত্তিসগড়ে গণহত্যাকারী বাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত বিপদজনক প্রবণতা, যা সারা দেশকে একটি পুলিশী রাষ্ট্রের পরিণত করবে।

এর আগে আমরা দেখেছি, বস্তারের সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর ড্রোনের সাহায্যে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। নকশাল দমনের নামে সাধারণ মানুষের উপরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যা চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপ। আমরা সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।”

হাইকোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল করা প্রসঙ্গে বিবৃতি (২৩.০৪.২০২৪)

‘‘কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে সকলেই অপরাধ করেনি। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে হাইকোর্টের নির্দেশে শাস্তি পেতে হবে সকলকেই। যারা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছে তাদেরও চাকরি বাতিল হবে এ কেমন বিচার? এই রায় মানবাধিকারের চূড়ান্ত পরিপন্থী।

আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস মনে করি, এই রায় আইনি বিচার প্রক্রিয়ায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লংঘন করেছে, যে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি বলে, হাজার অপরাধী ছাড়া পেলেও কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন সাজা না পায়। অথচ দীর্ঘদিন মামলা চলার পরেও, সমস্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া, বৈধ চাকরি প্রাপকদের বহাল রাখা এবং বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করা -এর কোনটাই হাইকোর্ট করতে পারেনি। তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ জনমনে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, যা বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করে দিতে পারে।

তাই আমরা দাবি জানাচ্ছি, এই রায় পুনর্বিবেচনা করে, দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক এবং যোগ্যব্যক্তিদের ও বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীদের সুবিচার দেওয়া হোক।”

সাংগঠনিক সংবাদ

রাজ্যস্তরের কিছু কর্মসূচি

"ভারতবর্ষের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের যথার্থ প্রতিফলন সম্ভব?" এই বিষয়ে ৩ মার্চ ২০২৪ সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটির সমরেশ বসু সভাগৃহে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস্-এর পক্ষে উজ্জয়িনী হালিম, আইএসআই কলকাতার অধ্যাপক স্বাগতম দাস, শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

অগণতান্ত্রিক সিএএ বাতিলের দাবিতে ৫ এপ্রিল ২০২৪ সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, প্রখ্যাত সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী, সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন। সভা পরিচালনা করেন সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক রাজকুমার বসাক।

সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে অগণতান্ত্রিক সিএএ বাতিলের দাবিতে ১৭ - ২৫ মার্চ ২০২৪, রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার, সাধারণ মানুষের জমি দখল, শাসকদলের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন সহ একটি প্রতিনিধি দল সেখানে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া ও প্রখ্যাত সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ী।

সন্দেশখালিতে নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং সেখানকার আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রানুছায়া মঞ্চে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস সহ অধ্যাপক আইনজীবী চিকিৎসক সংগঠন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি সবাই মিলিত হয়। অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, কৌশিক সেন, পল্লব কীর্তনীয়া, রিদ্ধি সেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, অর্ক ভাদুড়ী এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

সন্দেশখালিতে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে ১২ ফেব্রুয়ারি মানবাধিকার গঠন হিসেবে সিপিডিআরএস-এর এক প্রতিনিধি দল প্রথম সেখানে পৌঁছায়। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন সিপিডিআরএস এর রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি আইনজীবী গৌরাঙ্গ দেবনাথ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মল্লারিকা কুণ্ডু, চঞ্চল ঘোষ ও শফিক আলি।

বর্ধমান শহরের জাগরী হলে সিপিডিআরএস এর মুখপত্র পিপল্স রাইটস্ জানুয়ারি '২৪ উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী আব্দুস সালাম ও বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ মুজতবা আলী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত।

ন্যায় সংহিতা, নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা,স্বাক্ষ্য বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে, জাত ধর্মের নামে অস্থিরতা বন্ধ ও দেশের সকল নাগরিকদের জীবন জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে বর্ধমান শহরে সিপিডিআরএস এর মিছিল ২৮শে জানুয়ারি ২০২৪।

২৮ জানুয়ারি ২০২৪ বর্ধমান শহরের জাগরী হলে সিপিডিআরএস এর নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটির প্রথম মিটিং।

২২ জানুয়ারি ২০২৪ কলকাতায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী মহামিছিলে সিপিডিআরএস।

জেলাস্তরের কিছু কর্মসূচি

৩০ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার আগরপাড়ায় সিপিডিআরএস এর উদ্যোগে সিএএ বিরোধী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক রাজকুমার বসাক বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের নাড়াজোল ইউনিটের পক্ষ থেকে ২৯ মার্চ সিএএ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিডিআরএস এর কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন। ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে আইডেনটিটি কার্ড তুলে দেওয়া হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক, আইনজীবী সমীর কুমার রায় এবং শিক্ষক মানস কুমার জানা।

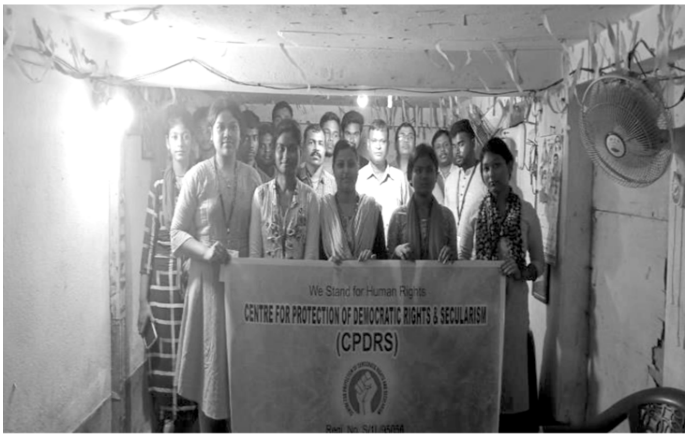

কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে ২৮ মার্চ **CPDRS** ও **CUEU** এর যৌথ উদ্যোগে **CAA** বিরোধী প্রতিবাদ সভা। এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন **CPDRS** এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সিপিডিআরএস এর কলকাতা জেলা সভাপতি মনোজ গুহ এবং **CUEU** এর সভাপতি শুভেন্দু মুখার্জি।

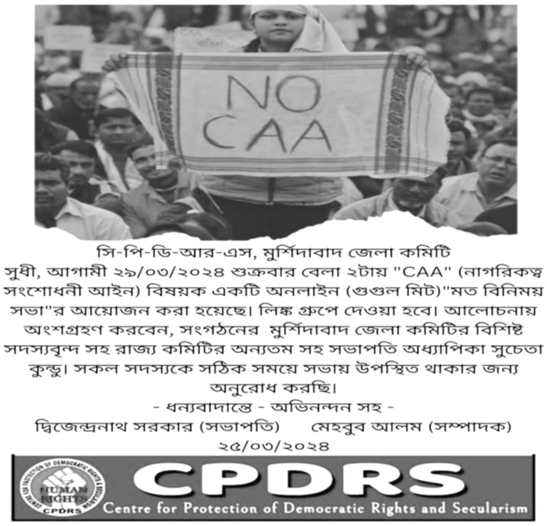

সিপিডিআরএস মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৯ মার্চ গুগল মিটে সিএএ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপিকা সুচেতা কুণ্ডু।

২৫শে মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে সিপিডিআরএস এর উদ্যোগে সিএএ বিরোধী মিটিং। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন, কার্যকরী কমিটির সদস্য শেখ আব্দুল আলিম।

২৩ মার্চ সিএএ বিরোধী নাগরিক সভা দক্ষিণ ২৪ পগণার বারুইপুরে। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, জেলা সম্পাদক জ্ঞানতোষ প্রামাণিক ও জেলা সভাপতি কানাইলাল দাস।

১৭ থেকে ২৩ মার্চ অগণতান্ত্রিক সিএএ বাতিলের দাবিতে সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে প্রতিবাদ সপ্তাহের শেষ দিন শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের আত্মোৎসর্গ দিবস পালন ও সিএএ বাতিলের দাবিতে বজবজে কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক রাজীব সিকদার। কর্মসূচিতে এলাকার ছাত্র যুব সহ স্টেশন সংলগ্ন পরিবহন শ্রমিকরা যুক্ত হয়।

দিল্লিতে আন্দোলরত কৃষকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং অগণতান্ত্রিক সিএএ বাতিলের দাবিতে ১৪ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস ও আইনজীবীদের সংগঠন লিগাল সার্ভিস সেন্টার যৌথভাবে প্রতিবাদ সভা করে। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিডিআরএস এর রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি দেবাশীষ চক্রবর্তী, লিগাল সার্ভিস সেন্টার এর বহরমপুর জজ কোর্টের ইনচার্জ এডভোকেট গোলাম মোস্তফা, সিপিডিআরএস মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক মেহবুব আলম, মোঃ রইসউদ্দিন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট আব্দুল আজিম, সঙ্গীত পরিবেশন করেন এডভোকেট নার্গিস তানজিমা, সঞ্চালনা করেন সিপিডিআরএস বহরমপুর কমিটির সম্পাদক লতিফ সরকার।

১০ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা শহরের সিপিডিআরএস ও লিগাল সার্ভিস সেন্টার এর পক্ষ থেকে মতবিনিময় সভা। সভাতে বক্তব্য রাখেন সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক মঙ্গল নায়ক, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কার্তিক রায়।

৯ মার্চ তমলুকে সিপিডিআরএস-এর নাগরিক সভাতে সিপিডিআরএস-এর অন্যতম সহ সম্পাদক অধ্যাপক মঙ্গল নায়ক বক্তব্য রাখেন।

৯ মার্চ বর্ধমান শহরে সিপিডিআরএস এর প্রথম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন এবং সহ-সম্পাদক সুভাষ জানা। সম্মেলন থেকে ঝর্ণা পালকে সভাপতি এবং আইনজীবী কাজী মোফাম্বর হোসেনকে সম্পাদক করে ২৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

৬ মার্চ ২০২৪ মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার মালিপাড়ায় একটি পরিবারের একজন সদস্যকে খুন ও অন্য ৩ জন সদস্যকে গুরুতরভাবে জখম করার ঘটনার প্রেক্ষিতে সিপিডিআরএস জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে যায়। আহতদের ও তাদের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কার্যকরী সভাপতি দেবাশীষ চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক মেহেবুব আলম, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য লতিফ সরকার, মোঃ রইসউদ্দিন প্রমুখ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন উপলক্ষে রায়না থানায় বৈঠক ও কমিটি গঠন।

নিষ্ক্রিয় আধার সক্রিয় করার দাবিতে সিপিডিআরএস পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন।

২৫ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ব্লকে রসুলপুর, নিমো এলাকায় আধারকার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া মানুষদের সাথে কথা বলতে এবং পাশে দাঁড়াতে সিপিডিআরএস এর প্রতিনিধি দল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন ফর্টিস হসপিটাল-এর সম্মুখে আনন্দপুর বসতি এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলে সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে তথ্য অনুসন্ধানকারী এক প্রতিনিধি দল সেখানে যায়। এই দলে ছিলেন সিপিডিআরএস-এর অফিস সম্পাদক রাজীব সিকদার, মানবাধিকার কর্মী আবুল হোসেন, গবেষক বিনয় পাল ও তানিয়া আমিন।

সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলায় মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে তীব্রতর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ও জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বাঁকুড়া শহরের ডিওসি হলে ২৫শে ফেব্রুয়ারী সিপিডিআরএস-এর প্রথম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন। শ্রী সুব্রত বিশ্বাসকে সভাপতি, আইনজীবী সুব্রত দাস মোদককে সম্পাদক ও শ্রী অচিন্ত্য মাজীকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন, অন্যতম সহ-সভাপতি তপন চৌধুরী ও স্থানীয় জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মানবাধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে হুগলী জেলার রিষড়ায় সাংগঠনিক সভা।

২১শে ফেব্রুয়ারী 'মাতৃভাষা দিবসে' রিষড়া চারবাতি মোড়ে সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে ভাষা দিবস পালিত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী সিপিডিআরএস মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষ থেকে সম্পাদক মহঃ মেহবুব আলম ও রাজ্য কমিটির সদস্য লতিভ সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় আধার নিষ্ক্রিয় করার সংবাদ দেখে উক্ত চিঠি প্রাপকের বাড়িতে যান এবং পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

---

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দেবগ্রাম এস এ বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হলো মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এর নদিয়া জেলা কর্মশালা। শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে এই কর্মশালায় মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহ-সভাপতি বশির আহমেদ এবং দেবাশীষ চক্রবর্তী।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম, আকুয়াটি, ঝাপান ডাঙ্গা, কেউ তারা জুহিহাটি প্রভৃতি এলাকায় প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কমিটির কার্যকরী কমিটির সদস্য ঝর্ণা পালের নেতৃত্বে সুদীপ সরকার, সেখ আজিম, সেখ কবির সহ চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এলাকাগুলিতে যায় এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সিপিডিআরএস কলকাতা জেলার উদ্যোগে কালীঘাট শরৎ পাঠাগারে "ভারতে ফৌজদারি আইনের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও মানবাধিকার" বিষয়ক একটি আলোচনা সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি ও সিপিডিআরএস প্রাক্তন সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। এছাড়া এই সভায় সিপিডিআরএস রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সহসভাপতি নভেন্দু পাল, কলকাতা জেলা সভাপতি অধ্যাপক মনোজ গুহ সহ কলকাতার নানান প্রান্ত থেকে আগত বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সন্দেশখালি সংহতি দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় পথসভা।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সন্দেশখালির ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে হুগলীর রিষড়া স্টেশনের সম্মুখে সিপিডিআরএস কর্মীরা।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সন্দেশখালি সংহতি দিবসে পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিডিআরএস কর্মীরা।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সন্দেশখালি সংহতি দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে সিপিডিআরএস কর্মীরা।

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সন্দেশখালি সংহতি দিবসে কোচবিহার শহরে রাজা রামমোহন স্কোয়ারে সিপিডিআরএস-এর পথসভা। বক্তব্য রাখেন গৌতম ঘটক, দিলীপ চন্দ্র বর্মন, প্রসেনজিৎ বসুনীয়া, আব্দুল মতিন আমেদ এবং আব্দুর রউফ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা।

৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, কাঁথির জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করার প্রতিবাদে সিপিডিআরএস পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পক্ষ থেকে জেলা শাসককে ডেপুটেশন।

৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, ১৩ বছরের নাবালিকা ছাত্রীকে নৃশংস খুনের প্রতিবাদে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মালদার ইংরেজবাজার থানায় সিপিডিআরএস প্রতিনিধি দলের ডেপুটেশন।

মালদার ইংরেজ বাজারে ১০ বছরের নাবালিকা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদে ২রা ফেব্রুয়ারী ২০২৪ কলকাতার যাদবপুরে সিপিডিআরএস-এর বিক্ষোভ।

মানবাধিকার সংগঠন CPDRS

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

উপদেষ্টামন্ডলী

সুজাত ভদ্র, সান্টু গুপ্ত, মহম্মদ বদরুদ্দোজা, এম সিরাজ, ডাঃ আলি হাসান, সুবোধ বসুরায়, নীহার কুমার হোড়, আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী, ডাক্তার সুভাষ দাশগুপ্ত, ডক্টর পায়েল রায়চৌধুরী দত্ত, সুধীন্দ্র চক্রবর্তী, অদিতি কুমার ধাওয়া, স্বাতী চক্রবর্তী, আইনজীবী অনুরাধা মন্ডল, আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম, বিধান চন্দ্র দাস, ডাক্তার ললিত খাঁড়া

সভাপতি

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত

কার্যকরী সভাপতি

অধ্যাপক সৌম্য সেন

সহ-সভাপতিমন্ডলী

রূপম চৌধুরী, নভেন্দু পাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, গৌতম ঘটক, দেবাশীষ চক্রবর্তী, বশির আহমেদ, ভারতী মৈত্র, প্রদীপ দাস, সোমনাথ ব্যানার্জি, কানাইলাল দাস, মনোজ গুহ, অরুণ সেন, সুচেতা কুন্ডু, গৌরাঙ্গ দেবনাথ

সম্পাদক

রাজকুমার বসাক

সহ-সম্পাদক

আব্দুর রউফ আমেদ, সুভাষ জানা, মঙ্গল নায়ক, রেশমা সিং

কোষাধ্যক্ষ

জ্ঞানতোষ প্রামানিক

অফিস সম্পাদক

রাজীব সিকদার

মুখপত্র সম্পাদক

প্রদীপ দাস

কার্যকরী কমিটি

মহঃ মেহবুব আলম, আয়ুব হোসেন, তপন চৌধুরী, স্বপন নাগ, জয়দীপ চৌধুরী, সেখ আব্দুল আলিম, শুধেন্দু হাজরা, মনোতোষ প্রামাণিক, তপন জানা, মল্লারিকা কুন্ডু, সুচন্দ্রা চৌধুরী, আলোক বসু, লীলাময় মন্ডল, ঝর্ণা পাল, সোহিনী চক্রবর্তী

রাজ্য কমিটি

কোচবিহার
আব্দুল মতিন আমেদ
শঙ্খনাদ চক্রবর্তী
নীরেন্দ্র চন্দ্র রায়
অমর কুমার পাল
শেখর ঘোষ
হীরেশ চন্দ্র দাস
বিপুল সাহা
ইদ্রিস আলী
তাপস রায়
দিলীপ বর্মন
সুকান্ত চক্রবর্তী
সুধাংশু কুমার দাস
চন্দন চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার
সঞ্জয় দেবনাথ

জলপাইগুড়ি
শেখ নাসিরুদ্দিন
রঞ্জিত মন্ডল

দার্জিলিং
সাহেবুল আলম

মালদা
গৌতম দাস

উত্তর দিনাজপুর
প্রদীপ সরকার

দক্ষিণ দিনাজপুর
ইন্দ্রজিৎ পাল

মুর্শিদাবাদ
গোলাম মোস্তফা
লতিফ সরকার
আব্দুল জলিল শেখ
কাজী নাজমুল ইসলাম
নিমাই চরণ সাহা
ইকবাল আব্দুহু
হারুন অর রশিদ
আব্দুর রউফ
মোঃ নুহিরুদ্দিন
মোঃ রইসউদ্দিন
খন্দকার গোলাম মোর্তুজা
ননীগোপাল কর্মকার
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর

জঙ্গীপুর
মুরশেদ জাহাঙ্গীর
সুব্রত মুখার্জি
রতন রায়

নদীয়া
মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল

বীরভূম
মিঠুন সিংহ রায়
তপন মুখার্জী
মোঃ জসিমুদ্দিন

বাঁকুড়া
হরিদাস ব্যানার্জি
সুব্রত দাসমোদক

পুরুলিয়া
যশোদা মাহাতো
সাগর মন্ডল

পূর্ব বর্ধমান
কাজী মোফাস্বর হোসেন
সুদীপ সরকার
জামাল মল্লিক
সেখ ইরফান

পশ্চিম বর্ধমান
পতিত পাবন ঘোষ

পূর্ব মেদিনীপুর
সঞ্জীব ক্যুইলা

পশ্চিম মেদিনীপুর
সমীর রায়
মানস রানা
অজয় গোপাল বেরা
নিমাই সন্ন্যাসী

উত্তর ২৪ পরগনা
সুনিতা সিং
সোমপ্রকাশ দাশগুপ্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা
তমাল মন্ডল

হাওড়া
ইমন কল্যাণ মিশ্র

হুগলি
সমীর সরকার
মহিম কুমার চ্যাটার্জি

কলকাতা
তপন সিনহা
আবুল হোসেন
জয়ন্ত বসু
শাহরুখ জিয়া
ডাঃ কবিউল হক
আফরিন আহমেদ
পুলক দে
দেবরঞ্জন দাস

রাজ্য কাউন্সিল

কোচবিহার

পুস্পেন্দু রায়
প্রসেনজিত বসুনিয়া
হরিপদ রায়
কালিশঙ্কর রাহা
রাজেন্দ্রনাথ বর্মন
গৌরাঙ্গ চন্দ্র সিংহ
দিলীপ চক্রবর্তী
অজয় দাস
ব্যোমকেশ রায়
সন্তোষ দেবনাথ
রমা প্রসাদ সরকার
বিভাস বর্মন
মিঠুন দাস

আলিপুরদুয়ার

রাজু দাস
স্বপন বৈদ্য

জলপাইগুড়ি

উত্তম সরকার
দ্যুতি রায়

মালদা

রফিকুল ইসলাম

মুর্শিদাবাদ

মাধব কুমার সিংহ
আলাউদ্দিন মন্ডল
আফাজুদ্দিন মন্ডল
আবু আজম
মাসুম আলী
সাগিরুদ্দিন আহমেদ

জঙ্গিপুর

সানোয়ার হোসেন
টোটন শেখ

নদীয়া

আনারুল হক
আব্দুল খালেক
আব্দুল্লাহ শেখ

বাঁকুড়া

ফাল্গুনী ব্যানার্জি
প্রভাত ব্যানার্জি
অশোক চক্রবর্তী

পূর্ব বর্ধমান

মহম্মদ আজিম শাহ
নজরুল শেখ

পশ্চিম মেদিনীপুর

সুজন মাইতি

হাওড়া

মাধুরি ঝা

হুগলি

বিষ্ণুচরণ পাত্র
সোমনাথ পাল
রাজঋষি চক্রবর্তী
কমল ঘোষ
আনন্দ ঘোষ
শেখ শামিদুল

কলকাতা

সুজয় দাস
প্রীতিলতা অধিকারী
শিবনাথ বিশ্বাস
সন্দীপন চক্রবর্তী
নালন্দা চৌধুরী
শ্যামল মন্ডল
তানিয়া বসু

উত্তর চব্বিশ পরগনা

আরতী সমাজদার
সমীর কুমার দে
শিবনাথ দে
অরিন্দম মন্ডল
সঞ্জয় ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

অজয় নায়েক
শেরীফ হোসেন পুরকায়েত
পুষ্পিতা মুখার্জী
নির্মল জানা
ফিরোজ উদ্দিন মোল্লা
সুধাংশু বৈরাগী
ধনঞ্জয় হালদার
প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী
সাদ্দাম হোসেন